শহর, গ্রামীণ অভিবাসী এবং শহরের দরিদ্র মানুষ ঃ হিংসা এবং সামাজিক বিচারের চিত্র

সংক্ষিপ্ত গবেষণা এবং আইনের রীতিনীতির উপর প্রভাব

প্রকাশকঃ মহানির্বাণ কোলকাতা রিসার্চ গ্রুপ
জি সি - ৪৫, সেক্টর - III, ফাস্ট ফ্লোর
সল্টলেক সিটি , কলকাতা - ৭০০১০৬, ভারত বর্ষ
ওয়েব ঃ http/://www.mcrg.ac.in

মুর্দ্রণ ঃ গ্রাফিক ইমেজ
নিউ মার্কেট, নিউ কমপ্লেক্স
সেকেন্ড ফ্লোর, রুম নং - ১১৫
কলকাতা - ৭০০০৮৭

অনুবাদকঃ ডঃ পরমা উকিল চ্যাটার্জি

এই প্রকাশনাটি " শহর, গ্রামীণ অভিবাসী এবং শহরের দরিদ্র মানুষ " প্রোজেক্টটির অন্তর্ভুক্ত। এই প্রোজেক্ট এর সঙ্গে জড়িত সমস্ত গবেষক, অংশগ্রহণকারী ও বক্তাকে ধণ্যবাদ জানাই। এম. সি. আর. জি. দলকেও অসংখ্য ধণ্যবাদ তাদের সহযোগিতার জন্য। ফোর্ড ফাউনডেশনের সহযোগিতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই ।

শহর, গ্রামীণ অভিবাসী এবং শহরের দরিদ্র মানুষ ঃ হিংসা এবং সামাজিক বিচারের চিত্র

সংক্ষিপ্ত গবেষণা এবং আইনের রীতিনীতির উপর প্রভাব

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা ..... ১ - ৪

প্রথম অধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত গবেষণা

বিভাগ ১ - কলকাতা ..... ৫ - ২৬

- শহরের উদ্বাস্তু ঃ দেশভাগ পরবর্তী অভিবাসীয় মানুষ এবং শহুরে ব্যাবস্থাপনা – কৌস্তোভ মানি সেনগুপ্ত
- শহরের পরিকল্পনা, অসতিস্থাপন এবং সমসাময়িক কলকাতার ন্যায়বিচারের চিত্র - ইমন কুমার মিত্র
- সমসাময়িক কলকাতায় অভিবাসীয় শ্রমজীবি মানুষ এবং তাদের অনিয়মিত কাজের বিবরণ - ইমন কুমার মিত্র
- মহিলা ও শিশু অভিবাসীয় শ্রমিকদের উপর কলকাতায় একটি গবেষণা - দেবারতি বাগচী ও সাবিব আহমেদ
- সেবামূলক অর্থনীতি এবং কলকাতায় নারীদের অভিবাসন - মাধুরীলতা বসু

বিভাগ ২ : দিল্লী ..... ২৭ - ৩৮

- রাজধানী শহর আইন ও নীতির কিছু অসংগতিপূর্ণ বিষয় ঃ - অমিত প্রকাশ
- ভূমির সার্বভৌমত্ব জমি অধিগ্রহণ এবং অভিবাসীয় শ্রমিক ঃ - মিথিলেশ কুমার
- দিল্লীর ‘‘পরিষেবামূলক গ্রামে’’ (Service village) অভিবাসীয় শ্রমিকদের অস্থায়ী কাজ এবং জীবনের চিত্র ঃ - ঈশিতা দে

বিভাগ ৩ : মুম্বাই ..... ৩৯ - ৫৭

- মুম্বাইয়ের গৃহহীন অভিবাসীয় মানুষ ঃ শহরের মধ্যে তাদের জীবন ও শ্রমের বর্ণনা - মণীশ কে. ঝা এবং পুষ্পেন্দু
- মুম্বাই শহরে অভিবাসীয় মানুষদের উত্থান এবং সমস্যার কারণ ঃ হিংসা এবং ন্যায় বিচারের চিত্র - সিম্প্রিত সিং
- শ্রমের ভয়ঙ্কর রূপ ঃ অস্থায়ী অর্থনীতিতে মৃত্যু এবং বার্ধক্যের চিত্র - মৌলেশ্বরি দাস
- অভিবাসন, নিরাপত্তারক্ষী এবং হিংসা মুম্বাইয়ের নিরপত্তারক্ষী কর্মীদের ওপর একটি প্রতিবেদন - ঋতম্ভরা হেব্বর ও মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিভাগ ৪ : শিলিগুড়ি এবং বিহারের কোশি এলাকা ..... ৫৯ -৬৭

- উত্তরবঙ্গের সংযোগস্থল ঃ বিশ্বায়নের পটভূমিকায় শিলিগুড়ি - সমীর কুমার দাস
- কোশি থেকে দিল্লী অভিবাসীয় মানুষদের জীবন যাত্রা ও শ্রমের বিবরণ - পুষ্পেন্দ্র এবং মনীশ কুমার ঝা

ভূমিকা

কলকাতা রিসার্চ গ্রুপ (CRG) গত দুবছর ধরে গ্রাম থেকে শহরে যেসব গরিব মানুষেরা কাজের সন্ধানে আসছে তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করছে। নগরান্নোয়ন-এর বিভিন্ন দিক, সামাজিক বিচারের চিত্র এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ঘটনাগুলি তাদের গবেষণার অংশ। এই গবেষণা প্রকল্পের নাম হল—শহর, গ্রামীণ অভিবাসী (Rural migrants) এবং শহরের দরিদ্র মানুষ হিংসা এবং সামাজিক বিচারের চিত্র। প্রাথমিকভাবে এটি দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই, শিলিগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) এবং কোশি (বিহার) এলাকার দরিদ্র অভিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। গবেষণাটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নগরান্নোয়ন-এর বিভিন্ন রীতিনীতি এবং অভিবাসী শ্রমের বিশেষ রীতিনীতি।

এই বইটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনটিতে রয়েছে কলকাতা, দিল্লী এবং মুম্বাইয়ের অভিজ্ঞতার কথা। চতুর্থ ভাগটিতে দুটি রচনা আছে যার বিষয় হল-অভিবাসনের সীমানা (frontiers of migration) মূলত ছোটো শহরগুলি এবং বন্যা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এর মধ্যে রয়েছে। বড় শহর সম্পর্কিত রচনাগুলির মূল বিষয় হল—নগরায়নের বিভিন্ন রীতিনীতি, শাসনপ্রক্রিয়া, শ্রমের বিভিন্ন দিক, অভিবাসন, শহরের অঞ্চলের বাড়িভাড়া এবং নবউদারনীতির মধ্যে সম্পর্ক। চতুর্থ ভাগটিতে নগরায়নের রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দেশভাগ কিভাবে অভিবাসী শ্রমের উৎপত্তি ঘটিয়েছে তাও বলা হয়েছে।

এই গবেষণাটিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ব্যাপক নগরায়নের ক্ষেত্র নয়। যদিও সম্পদ আদনপ্রদান এবং চাকরির সুযোগের উপর নগরায়নের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। যার সঠিক নির্মাণ সরকারি পরিসংখ্যান করে না। শহরের যে দুটি পরিচিতি চিত্র আমরা দেখতে পাই তা অসঙ্গতিপূর্ণ। একদিকে সেটি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি ইঞ্জিন অপরদিকে সেটি মানুষের ভাব আদানপ্রদানের একটি অপর্যাপ্ত নাগরিক স্থান। এই অসঙ্গতিগুলি ১৯৯০-এর নব উদারনীতির ফলে আরও বেশি করে প্রকট হয়েছে কারণ শহরগুলির মধ্যে নানারূপ বিভাজন ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে।

এই গবেষণাটি করার পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমটি হল এই অভিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করা যারা এই শহরের কেন্দ্রে বসবাস করে। দ্বিতীয়টি হল এই অভিবাসীদের নিয়ে একটি সাময়িক তত্ব এবং কাঠামো তৈরি করা (provisional theoretical framework) যেটা দেখে এদের সঠিক পরিসংখ্যান জানা যাবে এবং কতজন শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করে সেটাও বোঝা যাবে। তৃতীয়টি হল সরকারি নথিপত্র এবং নগরন্নোয়নে এদের উপস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা। যেসব মানুষেরা গ্রাম থেকে শহরে কাজের সন্ধানে আসে তাদের কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধে এবং রীতিনীতির আওতার বাইরে রাখা হয়। এদের জীবিকা এবং কাজের পরিস্থিতির সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। অনেকে বলেন যে, নবউদারনীতির ফলে শ্রম এবং কাজের অবস্থানের সম্পর্ক ক্রমশই বদলাচ্ছে। বর্তমানে শহর শুরু উৎপাদন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু নয়। এগুলো জ্ঞানমূলক অর্থনীতিরও কেন্দ্রবিন্দু। তাই মানুষভিত্তিক পুঁজি ছাড়াও প্রয়োজন স্থানভিত্তিক পরিষেবা যা জ্ঞানমূলক অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয়।

নগরায়ন তত্বগুলির প্রতিষ্ঠাতারা (হেনরি লেফেব্রে, ডেভিড হারভে এবং সাস্কিয়া শাসেন) মূলত নগরের পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং স্থাপত্য নির্মাণের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন যেগুলো সরকার দ্বারা অনুমোদিত। স্থানভিত্তিক উৎপাদন নিয়ে খুব গবেষণা হয়নি। সাম্প্রতিককালে শ্রমের যে নতুন দিকগুলি উঠে আসছে যেমন কল্যাণ সেনের রিথিঙ্কিং ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট (Rethinking Capital Development) সেখানেও স্থানভিত্তিক পরিষেবার কথা খুব একটা দেখা যায় না। নিয়মিত এবং অনিয়মিত কাজের উপরেই আলোকপাত করা হয়েছে। স্থান এবং শ্রমের ধরন এবং অবস্থা এবং তাদের সঙ্গে বার্ধক্য, বাড়িভাড়া, মজুরি এবং অনিশ্চয়তার সম্পর্কগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিবাসন যে নগরায়নের একটি মূল বিষয় সেটি এই লেখাটিতে আলোচিত হয়েছে। শুধুমাত্র নবউদারনীতির অংশ হিসেবে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে গণ্য করলে হবে না। শ্রমের স্থান কাল, অবস্থা, উৎপাদন এবং এদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলিকে এই শহরের পরিকাঠামোয় বুঝতে হবে।

এই গবেষণার প্রথম বিভাগটিতে পাঁচটি অংশ আছে। প্রথম অংশটি লিখেছেন কৌস্তোভ মানি সেনগুপ্ত। ইনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের পরবর্তী দেশভাগের সময় যে উদ্বাস্তুরা কলকাতায় এসেছিল তাদের পুণর্বাসন নিয়ে ঋিখেছেন। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হবার পরবর্তী কলকাতায় উদ্বাস্তুদের পুণর্বাসনের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন। এরা কোথা থেকে এসেছে, এদের পেশা কি ছিল, এরা কিরকম অবস্থায় বাস করে, এরা সরকার থেকে কিরকম সুযোগ- সুবিধা পায়—এইসব তার কাজে বিষয়। দ্বিতীয় অংশটি লিখেছেন ইমন মিত্র। গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় যারা কাজের সন্ধানে এসেছে তারা শহুরে পরিকাঠামোর কি কি সুযোগসুবিধা পাচ্ছে সেগুলো নিয়ে ইনি চর্চা করেছেন। সরকারি রীতিনীতি অনুযায়ী এইসব গ্রামীন অভিবাসীরা কি কি সুযোগ পান, নগরায়নের ফলে এদের কি কি উপকার হয়েছে, বিশেষত গত কয়েক বছরে বস্তিবাসী মানুষেরা আইন এবং সরকারি রীতিনীতির সুবিধেগুলো পাচ্ছেন কি এগুলো এই লেখাটিতে দেখা হয়েছে। তৃতীয় অংশটিও ইমন মিত্রের লেখা। বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যারা থাকেন তাদের জীবনযাপনের কথা এবং কলকাতায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপত্তি এই অংশের মূল বক্তব্য। এই দুটি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কি কি অসুবিধায় পড়ে, এদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম, এদের কতটা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, নাগরিক হিসেবে এরা কি কি সুবিধে পায় বা পায় না, স্থান সংক্রান্ত সমস্যা এবং উচ্ছেদের সমস্যার কথা এই অংশে বলা হয়েছে। চতুর্থ অংশটি লিখেছেন দেবারতি বাগচী এবং সাবির আহমেদ। দেবারতি লিখেছেন মহিলা কাগজকুড়ানীদের কথা। এদের বসবাসজনিত সমস্যার কথা এবং এদের ওপর শহুরে রীতিনীতির প্রভাবের কথা ইনি লিখেছেন। অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে এদের ধরা হয় না। কারণ, শহরের আনুষ্ঠানিক পরিকাঠামোর মধ্যে এরা পড়ে না। আহমেদের লেখার বিষয়টি হল রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বেড়ে ওঠা শিশুরা। যতই সরকারি রীতিনীতি ও সুপারিশ হোক, এদের শৈশব কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এই শিশুদের প্রয়োজন, সুযোগসুবিধা এবং চাহিদাগুলিকে তিনি তুলে ধরেছেন যাতে তারা বৃহত্তর সমাজের অংশ হতে পারে। পঞ্চম অংশটি লিখেছেন মাধুরীলতা বসু। ইনি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে নারী শ্রমিকদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। কলকাতায় সেবামূলক কাজে যারা যুক্ত যেমন নার্স এবং আয়া এনার কাজের বিষয়। এদের কাজের ধরন, আদি বাড়ি এবং গতিশীলতার (mobility) কথা উল্লেখিত হয়েছে। এইসব মহিলারা বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় আসে এবং কলকাতাকে মধ্যবর্তী করে বিভিন্ন জায়গায় যায়। স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চিকিৎসা চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন দিগন্ত।

দ্বিতীয় বিভাগটি দিল্লী শহরের উপর ভিত্তি করে লেখা যার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমটির লেখক অমিত প্রকাশ যিনি জাতীয় রাজধানী এলাকার (National Capital Territory) উপর লিখেছেন। এলাকাটি কিসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এবং এর আইনি রীতিগুলি বা কি তা এই আলোচনার বিষয়। নগরোন্নায়নের উপর সরকারের যে আধিপত্য রয়েছে তার প্রধান কারণ হল অমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং দিল্লীকে বিশ্বমানের শহর বানানোর উচ্চাকাঙ্খা। তাই সরকার পক্ষ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দরিদ্র মানুষের সুবিধার কথা অত গুরুত্ব দেয় না।

দ্বিতীয় অংশটি লিখেছেন ঈশিতা দে। লেখাটি নৃতাত্বিক (anthropoligical) বিষয়। যেসব অভিবাসী মানুষেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে দিল্লীর গুরগাঁও, গৌতমপুরী এবং ফরিদাবাদ এলাকায় থাকে লেখক তাদের সাথে কথা বলে তাদের জীবনযাত্রার কথা লিখেছেন। যেসব মহিলারা লোকের বাড়ি কাজ করে তাদের কাজের জায়গা কিরকম, তাদের কি কি অসুবিধায় পড়তে হয়, সরকারের কাছ থেকে তারা আলাদা করে কোনও সুযোগসুবিধায় পায় না এবং তাদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে—এইগুলি নিয়ে তিনি লিখেছেন।

তৃতীয় অংশটি লিখেছেন নিখিলেশ কুমার। আদিম সংগ্রহের (primitive accumulation) তত্বটি বিভিন্ন গবেষকদের চর্চার বিষয়। এই তত্বটির নিরীখে জমি অধিগ্রহণ, উচ্ছেদ, উচ্ছেদকারী এবং শ্রমিকদের স্বত্বার পরিবর্তনকে উনি বিশ্লেষণ করেছেন। এনার কাজের জায়গা হল দিল্লীর বিমানবন্দর এলাকা। উচ্ছেদ এবং শ্রমিকদের স্বত্বার মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই বেসরকারি করণের যুগে অভিবাসী মানুষেরা ধীরে ধীরে বিমানবন্দরে সরবরাহ (logistic) কর্মী হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

তৃতীয় বিভাগটি মুম্বাই শহরের তিনটি বিষয় নিয়ে লেখা। প্রথম অংশটি লিখেছেন মণীশ ঝাঁ এবং পুষ্পেন্দ্র। এরা বাস্তুহারা অভিবাসী মানুষদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। মুম্বাই একটি বিশ্বমানের শহর হিসেবে পরিচিত। এখানে শ্রমের নানারকম বিভাজন রয়েছে। শ্রমিকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে উচ্ছেদিত হয়ে এসে এখানে কাজ করে এবং তারা অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের স্থায়ী বসবাস করার জায়গার অভাব, তাদের কাজের নিরাপত্তা নেই। তাদের নানাবিধ হিংসার ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। এই হিংসা ও অপমান যেন তাদের পাওনা, তাই খুব বেশী এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এগুলিকে সাধারণ এবং বাঞ্ছনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অংশটি লিখেছেন সিম্প্রিত সিং। তিনি মুম্বাইয়ের সরকারি নথিপত্রে এবং অফিসের কাগজপত্রে অভিবাসী মানুষদের অবস্থানটা কিরকম সেটা দেখিয়েছেন। অভিবাসনের বিষয়টি যে কত জটিল এবং তার রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy) যে কতটা গভীর এই আধুনিক সমাজে সেটা তিনি তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অংশটি লিখেছেন মৌলেশ্বরী ব্যাস। অভিবাসীয় মানুষদের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার কথা ইনি লিখেছেন। এই মানুষেরা শারীরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক অবস্থান থেকে বঞ্চিত। এদের মৃত্যুর হার এবং দুটি ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবি বয়স্ক মানুষদের কাজের ধরন—এই দুটি বিষয় নিয়ে ইনি চর্চা করেছেন। পেশা দুটি হল সংরক্ষণের কাজ এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত শিল্পে কাজ।

চতুর্থ অংশটি মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতম্ভরা হেব্বরের লেখা। ওনার কাজের বিষয়টি হল নিরাপত্তারক্ষীদের জীবনযাপন। এরা নানারকম হিংসার রাজনীতির শিকার হয়। এদের সমস্যাগুলো সরললেখায় বুঝলে হবে না। এর বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থসামাজিক দিক রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং এদের দ্বারা হিংসা দুটোই খুব জটিল বিষয়। এদের প্রতিনিয়ত নানারকম গঠনমূলক হিংসার সম্মুখীন হতে হয়।

চতুর্থ বিভাগটির দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমটি লিখেছেন পুষ্পেন্দ্র এবং মণীশ কে ঝা। লেখাটিতে উত্তর বিহারের কোশি এলাকার আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এর সাথে অভিবাসনের বিষয়টির কি সম্পর্ক তাও দেখানো হয়েছে। অভিবাসনের ধরনটি কিরকম, ঠিকাদারদের ওপর কতটা নির্ভর করতে হয় (এখানে বলা হয় মেথ)কি কারণে তারা এই পেশায় নিযুক্ত, এর মধ্যে জাতপাতের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা এবং এদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কতটা এগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি লিখেছেন সমীর কুমার দাস। ইনি শিলিগুড়ি শহরের অভিবাসী মানুষদের নিয়ে লিখেছেন। এরা বিভিন্ন গ্রামঞ্চল থেকে এসেছে। শিলিগুড়িতে গত কয়েক দশকে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। বড় বড় বাড়ি উঠেছে। কলকারখানায় উন্নতি হয়েছে। নানারকম পেশায় মানুষ নিযুক্ত হচ্ছে। শিলিগুড়ি বর্তমানে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে কাজ করতে আসা মানুষেরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। এরা লোকের বাড়িতে এবং বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করে। এছাড়া সাফাইকর্মী (বর্জ পদার্থ পরিষ্কারের কাজ), ইলেকট্রিক ও কলের মিস্ত্রির কাজ করে।

এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হল—অভিবাসনের বিষয়টিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে নগরায়নের রীতিনীতিতে এবং সরকারি নথিপত্রে এইসব মানুষের কতটা উপস্থিতি রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে হিংসার নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এদের অস্তিত্যের পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। সরকারি নীতিকাররা এদেরকে শুধুমাত্র সংখ্যা হিসেবে গণ্য করে। এদের জীবনের সমস্যার কথা কেউ ভাবে না। নগরায়নের বিভিন্ন রীতিনীতি এবং আদমশুমারিতে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। হ্রাস পাচ্ছে এটা দেখা যায়। এই তথ্যের সঙ্গে নিরাপত্তা ও হিংসার একটি যোগাযোগ রয়েছে। এদের নানাবিধ অস্তিত্ব তাই অভিবাসী শ্রমিকদের নানরূপ বিভাজন হচ্ছে। এরা দুইরকমের হিংসার সম্মুখীন হয়। এরা নানারকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হয় এবং ন্যায়বিচার পায় না। অন্যদিকে, এদের উপর নানারকম শোষণ হয় ও তাদের শ্রমকে রীতিমত নিংড়ে নেওয়া হয়। এই মানুষদের লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, বয়স, আদিবাড়ি এবং ভাষা নানা প্রকারের হয়। তাই এদের মধ্যে গঠনমূলক প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান ভারতের প্রেক্ষাপটে এই গঠনমূলক বিষয়টিও চর্চিত হয়েছে। গবেষণাটির প্রত্যেকটি অংশ আলাদা হলেও এদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। আশা করা যায় সব মিলিয়ে অভিবাসন এবং নগরন্নয়নের রীতিনীতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে এই লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে। ভবিষ্যতে শ্রম এবং নগরায়নের ওপর গবেষণার কাজে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে এটাই আমাদের কামনা।

সংক্ষিপ্ত গবেষণা
বিভাগ ১ - কলকাতা

শহরের উদ্বাস্তু ঃ
দেশভাগ পরবর্তী অভিবাসীয় মানুষ এবং শহুরে ব্যাবস্থাপনা

—কৌস্তোভ মানি সেনগুপ্ত

পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব উদ্বাস্তু মানুষেরা কলকাতায় এসেছেন তাদের জীবনের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং দেশভাগ পরবর্তী কলকাতায় কিরূপ উন্নতি হয়েছে তাও বলা হয়েছে। সেই সময় উদ্বাস্তু মানুষেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিল। কলকাতায় প্রচুর মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল যেগুলিকে 'কলোনি' বলা হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথমদিকে যারা এসেছিলেন তারা অত্যন্ত ধনী এবং সম্ভ্রান্তশালী ছিলেন। তাই তারা শহুরে জীবনযাপন বেছে নিতে কলকাতায় এসেছিলেন। শহুরে পরিকাঠামোয় এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। শিল্প ও কলকারখানায় নানারকম ঝামেলা দেখা দিল। কালোবাজারিতে শহর ছেয়ে গেল। রাজনৈতিক অরাজকতা ও হিংসা ছড়িয়ে পড়ল। এইরকম অবস্থার মধ্যে উদ্বাস্তুরা তাদের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে গেল।

সরকার প্রথমদিকে উদ্বাস্তুদের আগমনের বিষয়টা সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। পরে ১৯৫০ নাগাদ সরকার বুঝল যে এদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক হারে ব্যাবস্থা করতে হবে। একদিকে এরা যেমনি সরকারের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে তেমনি সরকার তাদের নৈতিক দায় অস্বীকার করতে পারছিল না। এই বাস্তুচুত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য প্রচুর টাকা এবং জমির প্রয়োজন ছিল। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ভাবা হল। এই উদ্বাস্তু মানুষদের শ্রেণি এবং জাতের কথা মাথায় রেখে সরকার ঠিক করল এদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যারা ক্যাম্পে বাস করত তারাই এই প্রশিক্ষণগুলির মূল লক্ষ্য ছিল। যারা চাষবাস করত তারা পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য রাজ্যে কৃষিকাজে নিযুক্ত হল। তাই একটি ভঙ্গুর বা ভাগের নীতি তৈরি হল। এই মানুষদের আন্দামান নিকোবার এবং অন্যান্য রাজ্যে পাঠানো হল। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কৃষিযোগ্য কলোনি স্থাপিত হল। পুনর্বাসনের প্রতিবেদনে এবং বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে এদের শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে দেখান হল। তবে সরকারি উদ্যোগগুলি সবধরনের উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা দিতে পারলনা। শহরে মূলত দুই ধরনের উদ্বাস্তু ছিল। প্রথম দলটি মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবেশ থেকে উঠে আসা মানুষ যারা এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলি তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় দলটি ছিল গরিব মানুষদের যারা শহরের বাইরে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। এরা শহরের ছোটখাটো কাজে নিযুক্ত হল। হঠাৎ করে লোকসংখ্যা বেড়ে গেল কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজের সংখ্যা বাড়ল না। তাই তাদের আয় কমতে লাগল এবং তারা পরিবারের সচ্ছলতা ভালভাবে বজায় রাখতে পারল না।

সরকারী রীতিগুলি পুনর্বাসন এবং উন্নয়নের ওপর জোর দিতে লাগল কারণ উদ্বাস্তু এবং রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে দ্বন্দ দেখা দিতে লাগল। এই পুনর্বাসনের ব্যাবস্থায় রাজ্যের গরিব মানুষদের কথা গুরুত্ব পেল না। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা খুব জটিল হয়ে পরল। গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে আলোচনা হলেও মানুষের সামাজিক সত্তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। হিন্দু উদ্বাস্তু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে (যাদের নিজেদের বাড়ি ছিল) দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

এর পরের অংশটিতে সেইসব দরিদ্র বাসিন্দা এবং উদ্বাস্তুদের দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। এখানে অত্যাচার এবং সামাজিক বিচারের কথাও উঠে এসেছে। দেশভাগের ঘটনাটি মুসলিম সম্প্রদায়কে নিরাপত্তাহিনতার দিকে ঠেলে দিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই পাকিস্তান গিয়ে আবার পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসত। মুসলিম সম্প্রদায় এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ বেড়ে চলল। এই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অত্যন্ত দরিদ্র তাদের সমস্যা আরও প্রকট হল এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকেই মানিয়ে নিতে পারল না বিশেষ করে অনেককেই যখন পারিবারিক পেশা ত্যাগ করে নতুন পেশা ও ব্যাবসায় নিযুক্ত হতে হল তখন তাদের সমস্যা আরও বেড়ে গেল। অনেকে নানারকম শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করল। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ছিল না এবং ১৯৪৭ এর ঘটনার প্রভাব যেন ছায়ার মত তাদের জীবনে পড়তে লাগল।

মুসলিম এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হল যখন ১৯৫১ সালে স্বীকৃতি বিহীন পেশায় নিযুক্ত উচ্ছেদকারী মানুষদের নিয়ে জমি বিল পাস হল (Unauthorised Occupation of Land Bill)। ১৯৫০ এর কলকাতার দাঙ্গাগুলি শহরের অনেক সামাজিক পরিবর্তন এনে দিল। বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ঘর ছেড়ে বিভিন্ন 'মুসলিম' এলাকায় আশ্রয় নিল। নতুন এই বিলটির উদ্দেশ্য ছিল ''উদ্বাস্তুদের'' হাত থেকে বাড়িওয়ালাদের বা মালিকদের সম্পত্তি রক্ষা করা কারণ এগুলি বেআইনিভাবে উদ্বাস্তুরা দখল করেছিল। এই বিলটির আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের বিকল্প জমি দান করা। উদ্বাস্তুদের উৎখাত করা এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল না। বিলের প্রধান ভাবনা ছিল সেইসমস্ত মানুষদের চিহ্নিত করা যারা বেআইনিভাবে জমি দখল করত এবং যারা নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। কমিউনিস্ট নেতারা এই বিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে সরকারের কিছু ত্রুটি দেখতে পেল। বলল যে সরকার শুধু বড়লোক জমি মালিকদের স্বার্থ দেখছে।

এই বিলটির একটি ধর্মীয় দিকও ছিল, তাই শুধুমাত্র শ্রেণী যুদ্ধের পর্দা দিয়ে এটিকে আটকে রাখা গেল না। কমিউনিস্ট এবং সরকারের উদ্দ্যোগে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু এই শ্রেণিবিভেদ এবং ধর্মীয় পার্থক্যের জন্য কিছু মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরী হল। সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং নাগরিকত্ব নিয়ে এসেম্বলির সদস্যরা নানা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। বহু মুসলিম মানুষেরা নিজেদের বসতি ছেড়ে জন্য জায়গা আশ্রয় নিল, সেইসব জমি জায়গায় হিন্দু উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করল। এইসব মুসলিম মানুষদের নাগরিকত্ব এবং বিষয় সম্পত্তির অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

এইসব মানুষ বাস্তুহারা হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে বহু মুসলিম মানুষ পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার অঞ্চলে ছোট খুপরি ঘর বা পার্কে আশ্রয় নিল। দেশভাগের পরবর্তী কলকাতার সামাজিক গঠনের আমূল পরিবর্তন হল। উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়ল কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায় একঘরে হয়ে পড়ল।

উদ্বাস্তু মহিলারাও নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হাত লাগল, ক্যাম্প এবং কলোনীর জীবন তাদের কাছে কষ্টকর হয়ে উঠল। পুরুষ এবং মহিলা দুই পক্ষই কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বেরল। অনেক মহিলারাই স্থানীয় কলোনি স্কুলগুলিতে শিক্ষকতার সুযোগ পেল। অনেকে আবার বিভিন্ন অফিস, ছোট ব্যবসা বা বিক্রিবাটার কাজে জড়িয়ে পড়ল। সমস্যা হল ক্যাম্পে থাকা মহিলাদের। ওদের সরকারের উপর নির্ভর করতে হল কাজের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। এই মহিলাদের শ্রেণী বিভক্ত করা হল, তারা কতটা শিখবে এবং প্রশিক্ষণ নেবে নির্ভর করত তাদের শ্রেণী বিভাজনের উপরে। আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে

মহিলাদের বাইরের কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য করা হত। শ্রমের লিঙ্গবৈশম্যের স্বীকার হতে হল এই মহিলাদের। একদিকে মনে হত যে মহিলারা স্বাধীনচেতা হয়ে বাইরে কাজ করছে। অন্যদিকে সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকারী বিভেদগুলি প্রকট হয়ে উঠল। জনজীবন, অফিস, রাস্তাঘাট, ভীড় ট্রামবাসে মহিলাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেল এবং এদের অংশগ্রহণের ধরণও বদলাতে থাকল। একদিকে রাস্তাঘাটে মহিলার কাজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে এসব দেখে সমবেদনার সৃষ্টি হল। অন্যদিকে সামাজিক বিচারের প্রতি লোকেদের আস্থাও বাড়ল।

দেশভাগের পর কলকাতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকল। কলকাতা শহরে দেখা দিল যুদ্ধ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা এবং দুর্ভিক্ষ। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতার গোড়ার দিকে কলকাতায় কলেরার প্রকোপ দেখা দিল। জনস্বাস্থ্য পরিসেবা খুব একটা তখন ভাল ছিল না। শিয়ালদহ স্টেশনকে তখন নরকের সঙ্গে তুলনা করা হত। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের কথা সমস্ত খবরের কাগজে ছড়িয়ে পড়ল। এই দুরবস্থা থেকে বেরোনোর জন্য কিছু করা আবশ্যিক হয়ে পড়ল। উদ্বাস্তু কলোনী এবং ক্যাম্প গড়ে ওঠার ফলে শহরের গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটল। শহরের মধ্যে নানারকম ধর্মীয় আখড়া গড়ে উঠল, বিশেষত মুসলমানদের। কলকাতা কর্পোরেশন এবং কলকাতা উন্নতির ট্রাস্টদের দায়িত্ব ছিল এই অবস্থার মধ্যে শহরে জীবনযাত্রা রক্ষা করা। রাজনীতির প্রেক্ষাপটেও নানারকম পরিবর্তন দেখা দিল। কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বন্দ দেখা দিল। কমিউনিস্ট পার্টিরা এই সুযোগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কমিউনিস্ট পার্টিরা নিজেদের একটা রাজনৈতিক অবস্থান তৈরী করল। এদের সাথে উদ্বাস্তুদের এতটা সম্পর্কে তৈরী হল। বসতি স্থাপন এবং জনসংখ্যা দুই বেড়ে চলল। কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রী শৈবাল কুমার গুপ্তা এই বসতিস্থাপন, বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন, এই বিষয়গুলো নগরোন্নয়নের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়াল। জমির ঘাটতি দেখা দিল। তাই প্রশাসকরা অন্যান্য রাজ্যেও জমি খুঁজতে লাগল। কল্যানীতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে নতুন পৌরসভা গড়ে উঠল। ভারত স্বাধীন হবার পরে উপগ্রহ শহর (Satalite Twonship) গড়ে উঠল বিভিন্ন জায়গায়, চন্ডীগড় তাদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ সেই আদলে গড়ে উঠল কল্যানী ও দুর্গাপুর, তবে এর মধ্যেও নানারকম অসুবিধা দেখা দিল। শুধুমাত্র পুর্ব পাকিস্তান নয়, অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকেও অভিবাসীর মানুষেরা এইসব শহরে বসতি স্থাপন করতে লাগল। তাই শহরের কাঠামোর উপর চাপ পড়তে লাগল। শহরের মধ্যে বস্তিগুলির বিস্তার ভাবিয়ে তুলল শৈবাল গুপ্তকে। এই বস্তিগুলির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জলের ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। বাড়ী ভাড়ার নিয়মকানুন জটিল হয়ে পড়ল এই ভাড়াটে অর্থনীতির বাজারে। নতুন আবাসন প্রকল্প তৈরী হল। কিন্তু এত কম সময়ে এত আবাসন তৈরী করা গেল না, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার এই নিয়ে নিন্দা হল। জনসংখ্যা বেড়ে চলায় নগরোন্নয়নের প্রকল্পগুলির সেভাবে উন্নতি করা গেল না। চাকরীর সুযোগ কমল, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষরা চেষ্টা করলেও সেরকম উন্নতি করতে পারলনা। এর মধ্যে পরিকাঠামোর সমস্যা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি, মুসলিমদের থাকার জায়গার সঙ্কট, দাঙ্গা হাঙ্গামা সব মিলিয়ে আইন কানুন ব্যবস্থা খুব সঙ্কটের মুখে পড়ল।

পুনর্বাসনের আইনকানুনগুলি মানুষের সুবিধার্থে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সাথে সংযোজিত হল। দেশভাগের পরে যে উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটি শুধুমাত্র একটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না সেটি পুরো দেশের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই পুনর্বাসনের কাজটি খুব সহজ ও প্রযুক্তিগত ছিল না। সরকার এই উদ্বাস্তুদের নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেও সেগুলির বাস্তবায়ণ অতটা সহজ ছিল না।

তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিল এবং কালোবাজারী ছেয়ে গেল, যা থেকে হিংসার সৃষ্টি হল। পাটশিল্পে প্রায়শই ধর্মঘট দেখা দিল। কমিউনিস্ট পার্টিরা এই উদ্বাস্তুদের প্রভাবিত করা শুরু করল যা কংগ্রেস পার্টির উদ্বেগের বিষয় হল। যত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতে থাকল কংগ্রেস নিজের দলের অস্তিত্ব রাখার কথা ভাবাতে শুরু করল। তাই সরকার উদ্বাস্তুদের অবস্থার উপর নজর দিতে থাকল কারণ তারা তখন এই রাজ্যের বাসিন্দা, সরকার এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের প্রথমদিকে সেইভাবে গুরুত্ব দেয়নি তাই তারা আস্তে আস্তে সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে শুরু করল। সরকার নানারকম প্রকল্প এবং সুপারিশ আনতে থাকল এই উদ্বাস্তুদের সুবিধার্থে কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হল।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp72.pdf

শহরের পরিকল্পনা, বসতিস্থাপন এবং সমসাময়িক কলকাতার ন্যায়বিচারের চিত্র

—ইমন কুমার মিত্র

এই লেখাটিতে জীবনজীবিকা এবং বসবাসের দুটি বিষয় নিয়ে চর্চা করা হয়েছে। প্রথমটি হল নগরায়ণ এবং দ্বিতীয়টি হল গ্রাম থেকে শহরে কাজের সন্ধানে অভিবাসন। এই দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করেছিল বিভিন্ন অনুভূমিক (horizontal) এবং উল্লম্ব (Vertical) ব্যবস্থাপনা। এই ঘটনাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নগরায়ণের নিরিখে অভিবাসীয় মানুষের স্থানকাল এবং শ্রেণীর বিচার করা এবং এই স্থান কালের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করা—যাতে বোঝা যায় সামাজিক বিচারের উপর কতটা প্রভাব পড়েছে।

এখানে ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে দুই দলের মধ্যে হিংসাত্বক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। 'ভূমিপুত্র' এবং 'বহিরাগত' এই দুই দল এবং প্রথম দলটি নিজেদের অধিকার বাঁচানোর জন্য দ্বিতীয় দলটির উপরে অক্রমণ করত। শ্রমজীবি মানুষেরা রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে কলকাতায় কাজের সন্ধানে আসত। শারীরিক অত্যাচার ছাড়াও তাদের নানা সামজিক ও সংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে অপমানিত হতে হত, তাই ভিতরের লোক ও বাইরের লোকের মধ্যে দুরত্ব তৈরী হল। একটা অস্তিত্ব সঙ্কট তৈরী হল। অভিবাসন এবং নগরোন্নায়নের নিরীখে এই শারীরিক নিগ্রহ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হিংসা বা বিভাজনের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। কলকাতা (তখনকার দিনে এবং বর্তমানেও) হল পূর্ব ভারতের আদানপ্রদান এবং সাংস্কৃতিক চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান। ১৯১১ অবধি কলকাতা ছিল ইংরেজ শাসিত ভারতের রাজধানী এবং নানা রাজ্যের অভিবাসীয় মানুষদের জীবিকার পীঠস্থান। ভারতবর্ষ স্বাধিন হবার পরেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষে ভাবে পূর্ব ভারতের বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে মানুষেরা কলকাতায় কাজের সন্ধানে আসতে থাকল। এই সার্বজনিন এবং শহুরে ভাবমূর্তিটি কিছু হ্রাস পেল যখন শহরের নাম ক্যালকাটা থেকে কলকাতা হল। বাঙালী সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে ২০০৩-এ এই পরিবর্তনটি অনেকের কাছেই মনে হল বাঙালী সংস্কৃতির উন্নাসিকতা।

কলকাতার স্থানীয় মানুষদের অভিবাসীয় মানুষদের প্রতি একটা অহেতুক ভয় (Xenophobia) ছিল যেহেতু তারা বাইরে থেকে এসেছিল। তাই এইসব অভিবাসীয় মানুষদের বিরুদ্ধে নানারকম আক্রমণ ও হিংসার ঘটনা ঘটত। কিছু রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার লোকেরা নীচু শ্রেণীর অভিবাসী মানুষদের উপর হামলা চালাত যা নিয়ে বহু গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু এই সংকীর্ণ অনুভূতি, উদারনীতি এবং পরবর্তী পরিকল্পনার নিয়মকানুনের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা নিয়ে লেখা হত না। এই সম্পর্কের শুরুর একটা ইতিহাস ছিল। এটি শুরু হয়েছিল নগরায়ণের বিভিন্ন কর্মসূচী নবীকরণের সময় যেমন জওহলাল নেহরু জাতীয় নগরায়ণ প্রকল্পের নবীকরণ। (Jawaharlal Nehru National Urban Renwal Mission).

এই লেখার প্রথম অংশটিতে কলকাতায় অভিবাসন এবং আঞ্চলিক এলাকা স্থাপন নিয়ে কিছু গবেষণার উল্লেখ আছে যেমন ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালের কলকাতার উপর লেখা নির্মল কুমার বোসের 'ক্যালকাটা ১৯৬৪ ঃ একটি সামাজিক জরিপ (Calcutta 1964 A Social Survey, বম্বে লালভানী

পাবলিশং হাউস ১৯৬৮), এই বইটিতে কলকাতা নিগমের নথির উপর ভিত্তি করে জমি ম্যাপিং ও ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়েছে কলকাতা শহরে বসবাসকারীরা কীভাবে ভাষা এবং জীবিকার ভিত্তিতে অঞ্চলগুলিকে ভাগ করে বসবাস করে। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যাকে বিভিন্ন পৌরসভার ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছিল, বোস দেখতে চেয়েছিলেন এই বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলি কীভাবে ধর্ম, জাতিগত এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ভাগ হয়েছে। বোসের গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে ১৯১০ এবং ১৯২০ সালের দিকেও কলকাতার অঞ্চলগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষদের ভিত্তিতে ভাগ করা হত। যদিও ওনার সামাজিক অবস্থান বিষয়ক লেখাটিতে অভিবাসনের কথা সরাসরি ভাবে উঠে আসেনি কিন্তু উনি ভিন্ন রাজ্যের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন যারা জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। যেমন ওড়িশা থেকে শ্রমজীবী মানুষেরা কলের মিস্ত্রী, গ্যাসের কাজ এবং ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর পেশায় নিযুক্ত হত। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের মানুষেরা কলকাতায় এসে বিভিন্ন কলকারখানার কাজে নিযুক্ত হত। কলকাতা সম্পন্ধে এদের মানসিকতা কী ছিল এই লেখাটিতে প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে অনেককেই হিংসাত্মক ঘটনার কারণে স্থান পবিবর্তন করতে হত। ৫৩ নং ওয়ার্ডে হিন্দিভাষী কালোয়াররা বাস করত যারা লোহার কারখানায় কাজ করত। এই অঞ্চলিটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আধিপত্ত্ব ছিল। ১৯৪৬-৪৭ এর দাঙ্গার পর এরা এই অঞ্চলটি ছেড়ে ৭, ১০ আর ১৩নং ওয়ার্ডে এসে উঠল।

বোসের গবেষণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মিত্র এই অংশটি লিখেছেন। বসতি স্থাপনের পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে সেটি উনি উল্লেখ করেছেন এবং এর থেকেই যে অভিবাসীয় মানুষদের উৎপত্তি একথা তিনি বলেছেন। নগরায়ণের পরিকল্পনা এবং রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে কীভাবে অভিবাসনের বিষয়টি উঠে এসেছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। অভিবাসন নিয়ে পুরানো কিছু গবেষণায় দেখা দিয়েছে গত কয়েক দশক কলকাতার জনসংখ্যা কতটা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে অবাঙালী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩৪.০৬%, ১৯৫১ সাল থেকে ৪০.০৮% ১৯৭১ সালে। কলকাতার অন্য রাজ্যের অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যার অনুপাতে কলকাতার জনসংখ্যা কমেছিল। ১৯৫১-২৫.২৪% থেকে ১৯৭১-১৭.১%। ২০১১-র আদমশুমারিতে দেখা গেল ১.৮৮% বৃদ্ধির হার কমে গিয়েছে। এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে কম।

জয়সংখ্যার ঘনত্ব (Population density) ২০০১ এ ছিল ২৪৭১৮ প্রতি বর্গকিমি তা ২০১১ এ হল ২,৪২,৫৮ প্রতি বর্গকিমি। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জায়গাতেই এই অবস্থা হল। চাকরীর সুযোগ কমতে লাগল। কারণ কলকাতায় বড় বড় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হল।

চাকরীবাকরীর সুযোগ খুবই কমে এসেছিল তবুও প্রত্যেকদিন প্রচুর লোক অন্য রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কাজের এবং বসতির সন্ধানে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় আসতে লাগল। এরা বাধ্য হল বিভিন্ন পৌরসভার ওয়ার্ডে বাস করতে।

অভিবাসীয় মানুষেরা কেন এই কলকাতার বস্তি অঞ্চলগুলিকেই তাদের বাসস্থান হিসেবে বেছে নিল তার কারণগুলি নগরায়ণ পরিকল্পনার নানা তথ্যে বলা হয়েছে। কলকাতা পৌরসভার উন্নয়নের অধিকারিকদের রিপোর্টে এই কারণগুলি আলোচিত হয়েছে। এই অভিবাসীর শ্রমজীবী মানুষেরা কোথায়, থাকে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা কিরকম, সামাজিক জীবনে তারা কীভাবে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়, তাদের আদি বাড়িতে প্রায়শই যায় কিনা, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে এই মেলবন্ধনের সম্পর্কটি কিরকম এই সব বিষয়গুলির নগরায়ণ পরিকল্পনার নিরীখে দেখা হয়েছে। অভিবাসীর সংজ্ঞা প্রথম দেখা গেল কলকাতাতে

১৯৯৬-৯৭ সালের কিছু আর্থ সামাজিক গবেষণাপত্রে। তবে এদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ১৯৮০র দশকেই কলকাতা পৌরসভা গঠনের সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বস্তিগুলি শুধুমাত্র এদের বাসস্থান ছিল তা নয় এদের চাকরীর সুযোগও এখানে প্রচুর ছিল।

কলকাতা পৌরসভা উন্নয়নের পরিকল্পনায় (Calcutta 300 Plan for Metropolital Development) এবং বস্তির উৎপত্তি নিয়ে আলোচানা হয়েছিল কিন্তু তাদের মধ্যে কী সম্পর্ক বা যোগ রয়েছে তা নিয়ে বিশেষ লেখালেখি হয়নি। ১৯৮৯-৯০ সালের বস্তিবাসী মানুষদের আর্থসামাজিক জীবন নিয়ে গভীর আলোচনা শুরু হল।

এই লেখাগুলিতে অভিবাসন এবং বস্তিতে বাস করা মানুষ এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের কথা লেখা হল। অভিবাসনই যে বস্তি গঠনের প্রধান কারণ সেটা উল্লেখিত হল। দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথাও উঠে আসল। ১৯৮৯-৯০-র গবেষণায় বলা হল এই বস্তিগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চল হিসেবে ভাগ করা যায়, কারণ বিভিন্ন ভাষায় মানুষ এখানে বাস করে। দ্বিতীয়ত গ্রাম ও শহরের মেলবেন্ধন তৈরী হল কারণ অভিবাসী মানুষেরা মাঝে মাঝে তাদের আদি জায়গা থেকে ঘুরে আসত।

১৮৮১ সালে নগরায়ণের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সেটি হল জমির স্বত্ত্ব সংক্রান্ত আইন। এই আইনের মোতাবেক সরকার সমস্ত বস্তি জমি অধিগ্রহণ করল এবং সেই সংক্রান্ত পদ্বতিগুলির নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নিল। এইভাবে তারা বস্তিবাসী ও ঠিকাদারদের ধনী বাড়ীওয়ালাদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করল। ১৯৭৬ এ জমি সিলিং এর উপর আইন পাশ হল। সরকার এই সমস্ত জমিগুলি অধিগ্রহণ করল। জমির আসল মালিকদের স্বল্প পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিল। এতে বোঝা গেল সরকার এই সমস্ত বস্তিবাসীদের কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল। নগরায়ণের আর একটি বিষয়ও উঠে এল সেটি হল জমি এবং শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় সেই কলকাতার বস্তিগুলি তৈরী হয়েছিল গ্রাম এবং ভিন্ন রাজ্যের মানুষদের থাকার জন্য। সময়ের সাথে সাথে জমি ব্যবহারের রীতি বদলাল । সেই সঙ্গে বদলে গেল উৎপাদনের পরিকাঠামো এবং প্রক্রিয়া। মিত্র ওনার লেখাটিতে জমির রাসায়নিক পদ্বতিতে পুনঃব্যবহার, উদারনীতিতে নগরোয়াণের পরিকল্পনা এবং পুনঃর্বাসনের প্রকল্প - এই তিনটির মধ্যে পরিবর্তীত সম্পর্কের কথা লিখেছেন। এই পুনঃব্যবহারের বিষয়টি বুঝতে গেলে দুটো ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে— স্থানচ্যুত হওয়া এবং পুর্নবাসন। এই বিষয়টি খুবই ভায়াবহ কারণ এখানে পুঁজির গতীশীলতা বাড়াতে গিয়ে শ্রম ক্ষমতার গতীশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। এই ঘটনার নিরিখে আবার অভিবাসন এবং শ্রমের অনিময়তার বিষয়গুলিও মাথায় আসে। এই অনিময়তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নগরের বসতি স্থাপন এবং বাড়ি ভাড়ার বিষয়গুলি। শহরে জমির পুর্নব্যবহারের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে— অভিবাসীয় মানুষদের বসতি এবং শহরের জমির পুর্নমূল্যায়ণ। ১৯৮১-এ ঠিকা জমির ভাড়া সংক্রান্ত আইনে শহরের এই কমমূল্যের বসতিগুলিকে আনুষ্ঠানিকতার তকমা দিল। সরকারী আইন অনুযায়ী বাড়িওয়ালাদের চিহ্নিত করে এবং বংশানুক্রমে ভাড়া (বাড়ির এবং জমির) আদায় কারার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে সরকার আইনী ব্যস্তি ও বে-আইনী কলোনিগুলিকে চিহ্নিত করে। এছাড়া স্থায়ী স্থাপত্য এবং অস্থায়ী বস্তিগুলিকেও চিহ্নিত করে। এই আইন অনুযায়ী বস্তিতে বসবাসের জায়গা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। বস্তিতে জল, বাথরুম, বিদ্যুত— সব কিছুর ব্যবস্থা করলো পৌরসভা।

এই আইনের বাইরে যে বস্তিগুলো ছিল তাদের বে-আইনী ঘোষণা করা হল এবং সেখান থেকে তাদের যখন তখন উচ্ছেদ করা হত। এইসব বে-আইনী বস্তিগুলি পৌরসভার সুবিধা গুলি ভোগ করত না। এই আইনি এবং বে-আইনী বস্তিগুলির মধ্যে পার্থক্য আরো বেশী হল যখন নতুন করে আরো অভিবাসীয় মানুষেরা আসতে লাগল। নতুন যারা আসল তাদের পক্ষে এই বে-আইনী বস্তিগুলোয় বাস করা একদমই সহজ ছিলো না। মাঝে মাঝে ঠিকাদাররা কিছু অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করত। যেমন বাড়ি তৈরীর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা রাত্রিবেলা ঐ সমস্ত অর্দ্ধেক তৈরী হওয়া বাড়ীর ছাদেই মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজত। অনেক সময় থাকার জায়গার অভাবে এই ধরণের শ্রমিকরা ফুটপাতেই রাত কাটাত।

মিত্র এই লেখাটি শেষ করেছেন সাম্পতিক কালের একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেখানে পরিবেশের উন্নতির দোহাই দিয়ে কিছু অভিবাসীয় মানুষদের বস্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই মানুষগুলো অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণীর এবং এদের অর্থনৈতিক জীবনও অনিয়নিত এবং অনিশ্চিত। এরা প্রধানত জিনিসপত্র ঠেলা গাড়ী করে নিয়ে যাওয়া, রিকসা চালানো, ঠিকাদার শ্রমিক, এবং বাড়ীর কাজের লোকের পেশাতেই নিযুক্ত। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই ধরণের কাজের লোক দৈনন্দিন জীবনে খুবই প্রয়োজন এবং শহরের অর্থনীতি চালু রাখতে এদের ভূমিকা অপরিসীম। এদেরকে বাদ দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রম এবং জমির পূর্নব্যবহার করার জন্য নিয়মকানুনের পরিবর্তন করার দরকার। তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশেও পরিবর্তন ঘটবে। নোনাডাঙ্গার এই ঘটনাটিকে কে.এম.ডি.এ (KMDA) ২০১২ সালে প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছে উন্নয়ণের খাতিরে জমি নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বড় বড় আবাসন এবং আমোদের জায়গা তৈরী হবে। কিন্তু এই ধরণের উন্নয়ন অনিয়মিত অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে। শহুরে জমি পূর্নমূল্যায়ণ হয় কিন্তু অর্থনীতির অস্থায়ী মানুষদের উচ্ছেদের শিকার হতে হয়। এই ঘটনাটিতে শহুরে জমির পুর্নব্যবহার এবং অস্থায়ী বা অনিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে একটি সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp72.pdf

সমসাময়িক কলকাতায় অভিবাসীয় শ্রমজীবি মানুষ এবং তাদের অনিয়মিত কাজের বিবরণ ঃ

— ইমন কুমার মিত্র

এই লেখাটিতে শ্রমের বিষয়টিকে অভিবাসন এবং শহরের জায়গার ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। গত দুদশক ধরে অভিবাসনের রীতিগুলিতে কিছু বদল ঘটেছে। এর কারণ হল নগরায়ণের নতুন রীতিনীতি, কারখানার পরিবর্তে বড় বড় আবাসন তৈরী হওয়া এবং শহরের মানুষদের শ্রম এবং কাজের পরিবর্তন। শ্রমের বিষয়টি বুঝতে গেলে এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে।

উদারনীতিরও নগরায়ণ হয়েছে এই কলকাতা শহরে। পুঁজিবাদী সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করতে এখন অনিয়মিত উৎপাদন ক্ষেত্রের সংখ্যা বাড়ছে যেমন এস.ই.জেড. (SEZ) তবে এগুলি সরকারের দ্বারা অনুমোদিত। নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন অঞ্চল তৈরী হচ্ছে যা পুঁজিবাদকে আরো বিকশিত করে। নগরায়ণ এবং নবউদারনীতির মধ্যে একটি যোগসুত্র হল অবস্তুগত শ্রম (Immaterial Labour)। এই তত্ত্বটিকে মাইকেল হার্ড এবং অ্যান্টনিও নেগরি তুলে ধরেছেন। ২১ শতকের পুঁজিবাদের সংজ্ঞাই হল এই বস্তুগত শ্রম থেকে সরে এসে অবস্তুগত শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা। তার মানে হল বিভিন্ন যন্ত্রপাতী এবং প্রযুক্তির ব্যবহার। শহুরে সৌন্দার্যায়ণের এদের প্রচুর ভুমিকা তবে একথা মনে রাখতে হবে যে দৈনন্দিন শহুরে জীবনে এই বস্তুগত শ্রম ছাড়া চলাই মুশকিল। শহরে এখন রেন্ট ইকোনমি। মানে ভাড়া খাটানো ঠিকাদারী ব্যবসা এখন বর্তমান অর্থনীতির অঙ্গ। এই অর্থনীতির আরেক প্রান্তে রয়েছে অভিবাসীয় শ্রমিকরা। এই লেখাটিতে দুই ধরণের শ্রমের কথাই বলা হয়েছে। যার ভিত্তিতে এই অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে। অভিবাসীয় শ্রমিকদের এই অনিয়মিত শ্রমের উপরে বেশী নির্ভর করতে হয়। যে দুটি কাজের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে তা হল কঠিন বর্জ্য পদার্থ ফেলার ব্যবস্থাপনা এবং বাড়ি নির্মাণ করা। এই দুটি ক্ষেত্রেই প্রচুর অভিবাসীয় মানুষ শহরে এসে কাজ করে এবং এদের কাজের বৈশিষ্টের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে এই বর্জ্য পদার্থ ফেলার কাজে মানুষেরা আসে। বাড়ি তৈরীর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আসে। বর্জ্য পদার্থ ফেলার কাজ যারা করে স্বাধীনতার আগে থেকেই এদের পূর্ব পুরুষেরা এই কাজ করে এসেছে। তাই দুই-তিন প্রজন্ম ধরে তারা কলকাতায় বাস করছে। খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিকরা কিছু নির্দিষ্ট মরসুমে বাড়ি তৈরী কাজের জন্য আসে এবং তাদের পরিবারের লোকেরা গ্রামে বা ছোট শহরেই থাকে। এদের কাজের ধরণ, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এবং সামাজিক সত্ত্বার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বেশীর ভাগ উন্নত দেশগুলিতে এই বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার কাজটা পুড়ন এবং জমিতে মাটি ফেলে করা হয়। কিন্তু কলকাতায় দেখা গেছে যে এই বর্জ্য পদার্থ গুলিকে খোলা জায়গায় রাখা হয়। এই ব্যবস্থাপনাটিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়— আবর্জনা পরিস্কার করা, জোগাড় করা, গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলিকে অন্যস্থানে ফেলা। কলকাতায় আবর্জনা ফেলার বড় জায়গার সংখ্যা ৬৬৪। যেগুলি করে এই আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হয় তা কলকাতা পৌরসভার অধীনে। প্রত্যেকদিন পাঁচ হাজার মেট্রিক টনের বেশী আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। এই আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থাটির মধ্যে দক্ষতার অভাব রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হল এই আবর্জনাগুলিকে ঠিক মতো বাছাই করে রাখা হয় না। যেখান থেকে এগুলিকে সংগ্রহ করা

হয় বা যেখানে এগুলিকে ফেলা হয় সেটি শুধুমাত্র যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার এবং পরিবেশ দূষণের বিষয় তা নয়, এই ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বর্জ্য পদার্থ পুনরায় লাভের সাথে ব্যবহার করা। আবর্জনাগুলিকে জ্বালানিতে পরিণত করা হল এই শহরগুলির লক্ষ্য। ভারত সরকারের নগর উন্নয়নমন্ত্রক এর নাম দিয়েছে মিশন স্টেটমেন্ট এন্ড গাইড লাইন (বিবৃতি এবং নির্দেশিকার প্রকল্প)। কলকাতা পৌরসভাও এই নির্দেশিকাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এরা ভ্যাট বর্হিভূত কলকাতা গড়তে চায় এবং আবর্জনা থেকে শক্তির উৎপাদন কেন্দ্র গড়তে চায় রাজারহাট, নিউটাউনে। কিছু পৌরসভার বরোতে ব্যাটারি দ্বারা চালিত গাড়ির ব্যবহারও শুরু হয়ে গেছে। এই শ্রমিকদের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে তাই সরকারী এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যখন এই বর্জ্য পদার্থ নিয়ে আলোচনা হয় তখন শ্রমিক বলতে বোঝানো হয় মূলত বসতবাড়ী আর ব্যবসায়িক কেন্দ্রের হাইড্রেন আর সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করার শ্রমিক। নোংরা একত্রিত করা বা নোংরা পরিস্কার করার কাজ যারা করে তাদেরকে সাফাই কর্মচারী বলা হয়। ১৯৯৩তে সাফাই কর্মচারীদের জাতীয় কমিশন গঠিত হল যা এই মানুষের দ্বারা আবর্জনা পরিস্কার করার কাজটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৯৩-এ একটি আইন পাশ হল এই কর্মচারীদের কাজে নেওয়া নিষিদ্ধ করতে (Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act)। সাফাই কর্মচারীদের কাজ ছাড়া অন্যান্য জিনিসও এই বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনায় জরিত আছে। যেমন রাস্তা-ঘাট ঝাট দেওয়া, ট্রাক চালানো, ড্রেন পরিস্কার করা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজকর্ম যেমন নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার। এভাবে ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা গেল এই পরিস্কার করার প্রক্রিয়ায়।

নানা বেসরকারী সংস্থা এই বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার পরিশেবায় নিযুক্ত হলেও কে.এম.সি. (K. M. C.) সবচেয়ে বেশী সাফাই কর্মচারী নিয়োগ করে। ব্রিটিশের অধীনে যখন ভারতবর্ষ ছিল তখন থেকেই ভাঙ্গী সম্প্রদায়েরা এই ঝাড়ুদার বা সাফাই কর্মীর কাজে নিযুক্ত ছিল। এরা শহরের আবর্জনা ছাড়াও মানুষের মলমূত্র এবং মৃতদেহ পর্যন্ত পরিস্কার করেছে। এই ধরণের কাজের কথা স্বাধীনতার পরেই হয়েছে যেমন ভাঙ্গী, মেহতার এবং বাল্মীকি সম্প্রদায়ের লোকেরা রাস্তা ঘাট পরিস্কার, ড্রেন এবং সেফটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করার কাজ গুলি বংশানুক্রমে করে এসেছে। যাদের অল্প প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা আছে সেই সব শ্রমিকেরা অন্য সম্প্রদায় থেকে আসত। কিন্তু যাদের দক্ষতা প্রায় নেই তারা এই সাফাই কর্মী বা জমাদার শ্রেণী থেকে আসত। এই জমাদার শ্রেণীর লোকেরা খুব অল্প মজুরীতে কাজ করত। এদের কাজ অনিয়মিত ছিল এবং স্থায়ী ছিল না। কাজের নিরাপত্তার অভাব ছিল এবং এরা নানা ধরণের সামাজিক শোষণের স্বীকার হত। এছাড়াও এদের থাকার খুব অসুবিধা ছিল এবং কাজের অবস্থাও ছিল ভয়াবহ। কিছু সাফাই কর্মী পৌরসভার তৈরী বস্তিতে থাকত। বাকীরা নানা রকম কলোনিতে কোনমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগার করত। এদের কাজের ধরনের জন্য বস্তিতেও থাকতে দিতে চাইত না বস্তি বাসীরা।

পূর্বে আলোচিত ১৯৯৩-এ সাফাই কর্মীদের যে আইনটি পাশ হয়েছিল এতে জমাদারের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু এই আইনের ফলে বহু দলিত শ্রমিকরা কাজ হারাল এবং তাদের কাছে অন্য কোনো কাজের সুযোগ ছিল না। এছাড়া বর্জ্য পদার্থ পরিস্কার করার কাজটি ধীরে ধীরে আধুনিক হতে থাকল। তাই মানুষের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গেল। রাত্রিবেলা মাথায় করে এইসব বর্জ্য পদার্থ নিয়ে যাওয়ার চিত্রটা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। এই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ হল এখনকার

''স্বচ্ছভারত অভিযান''। যেখানে দেখা যায় দেশবাসীরা নিজে হাতেই ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা ঘাট এবং বাড়ির অলিগলি পরিস্কার করছে। এই জমাদার শ্রেণীর সংখ্যা কমে এল এবং এই কাজটা মানুষের কাছে নিষিদ্ধ বলে মনে হত। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এখন ঝাঁটা যেন আন্দোলনের হাতিয়ার। কলকাতার সাফাইকর্মীদের স্থায়ী অভিবাসীয় শ্রমিক বলা হয়। তাদের আদি জায়গার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে তারা কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বাস করে কারণ নতুন জায়গায় গেলে তারা অবসর গ্রহণের পরে যে সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলি পায় তা আর পাবে না। বাড়ি তৈরীর কাজে যেসব শ্রমিকরা নিযুক্ত তারা স্থায়ীভাবে কোথাও থাকে না। যেই সব ঋতুতে চাষবাস হয় না সেই সময় এই শ্রমিকরা বাড়ি নির্মাণ করার কাজের সন্ধানে শহরে আসে। মূলত কলকাতার নিকটবর্তী জেলাগুলি থেকে আসে যেমন উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর। শহরের ঠিকাদাররা গ্রামে গিয়ে এইসব শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করে কাজ দেয়। অনেক সময় শ্রমিকেরা কাজের সন্ধান না করেই শহরে আসে। তারপর শেয়ালদহ, উল্টোডাঙ্গা ও বিধাননগর এলাকায় বা স্টেশনে অপেক্ষা করে। ঠিকাদাররা এদেরকে খুঁজে নিয়ে কাজ দেয়।

গত কুড়ি বছরে আবাসন এবং বিভিন্ন ধরণের বাড়ি নির্মানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। অনেক বন্ধ হওয়া কারখানাতে এখন বিভিন্ন আবাসনের কাজ চলছে। পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে। উড়ালপুল, ব্রিজ, বাইপাস মেট্রো রেল সব মিলিয়ে কলকাতার অনেক আধুনীকিকরণ হয়েছে। তবে এই বাড়ী নির্মাণ কাজে যারা নিযুক্ত তাদের কাজের নিরাপত্তার অভাব আর অনিশ্চয়তা এখনও বর্তমান। প্রতিনিয়ত এরা শোষিত হয়, এদের থাকার জায়গার অভাব এবং এদের অনেক বিপদজনক কাজের সম্মুখীন হতে হয়। এটা বললে ভুল হবে যে সরকার এই নিয়ে ভাবছে না। ২০০৫ এ গঠন পশ্চিমবঙ্গের বাড়ী এবং নগর নির্মান কাজে যুক্ত শ্রমিকের কল্যানের জন্য যে বোর্ড গঠন হয়েছিল তার ধারায় কাজ করছে ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসা তৃণমূল সরকার। এটি ১৯৯৬ এ একটি আইন হিসেবে পাশ হয়েছে। বর্তমানে ১৮-৬০ বয়সের শ্রমিকেরা এই প্রকল্পটির সুযোগ সুবিধাগুলি পায়। এদের ১২ মাসের মধ্যে নুন্যতম ৯০ দিন কাজ করতে হবে। এরা হসপিটালে চিকিৎসার খরচ, প্রতিবন্ধী হলে ক্ষতিপূরণ, টিবি রুগীদের চিকিৎসার খরচ, পেনসন, মৃত্যুকালীন ক্ষতিপূরণ, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ এবং বাইসাইকেল কেনার খরচ পাবে। এই সুবিধাগুলি পেতে গেলে এদের একটি ''সামাজিক মুক্তি কার্ড'' সংগ্রহ করতে হবে। এটি স্মার্ট কার্ড হিসেবে কাজ করে এবং টাকা তাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে আসে। নির্মাণ কাজের এক শতাংশ নিয়োগ কর্তার থেকে এবং এক বছরে ৩০ টাকা শ্রমিকদের থেকে নিয়ে এই তহবিলে জমা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকল্পটি খুবই সন্তোষজনক বলে মনে হলেও এর মধ্যে নানা সমস্যা আছে। এই প্রকল্পটি অন্য রাজ্যের অভিবাসীয় মানুষদের জন্য নয়। ভিন রাজ্য থেকে অনেকেই কলকাতায় এসে কাজ করে। হতে পারে তাদের নাম সেই রাজ্যের একই ধরণের প্রকল্পে নিবন্ধিত রয়েছে। কিন্তু তারা কলকাতায় কাজ করে এবং নানাভাবে শোষিত হয়। তাও এরা এই আইনের আওতায় পড়ে না। আরেকটা সমস্যা হল যারা ১৮ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশি তারা এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে না কিন্তু বাড়ি তৈরীর কাজে বিভিন্ন বয়সী লোকেরা কাজ করে। বিশেষ করে বাচ্চারা বা কিশোররা রাজমিস্ত্রীদের সহকারী হিসেবে কাজ করে। বয়স্ক চৌকিদার হিসেবে এই বাড়ি গুলিকে দিনরাত পাহারা দেয় তাই এদেরকে বাদ দিয়ে এই প্রকল্পটি পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারে না। আরেকটা সমস্যা হল শ্রমিকদের ব্যাঙ্কে একাউন্ট থাকতে হবে এই সুবিধাগুলি পেতে গেলে বেশীরভাগ

গরীব মানুষদের কাছে যা নেই। মহিলা শ্রমিকরা কোনও বাড়তি সুযোগ সুবিধা পায় না। এদের যৌন হেনস্থা এবং অল্প মজুরীর শিকার হতে হয়। এই কাজের মধ্যে জাতি, বর্ণ, ধর্মের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বেশীরভাগ মানুষ যারা এই আবাসন তৈরীর কাজে নিযুক্ত তাদের মধ্যেও কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের আধিক্য থাকে। কিছু নির্দিষ্ট কাজ আবার নির্দিষ্ট জাতের লোকেরাই বংশানুক্রমে করে থাকে যেমন কাঠের মিস্ত্রীর কাজ করে মালদা ও মুর্শিদাবাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের প্রচুর দক্ষতা এই কাজে, যদিও কাঠের মিস্ত্রির কাজ আর বাড়ি নির্মানের মধ্যে আগে যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু হালফিলের ফার্নিচার বা আসবাব পত্র সমেত কাঠের বাড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে এদের কাজের চাহিদাও বাড়ছে। অনেক সময় তারা নিজেদের ধর্মের কথা বলে না। কারণ হিন্দু বাড়িতে ঠাকুরের আসবাবপত্র বানানোর কাজে ঠিকাদাররা তাদের নিযুক্ত করে। যদি কেউ মনে পবিত্র স্থানের অসম্মান হচ্ছে তাই তারা নিজেদের কথা বেশী বলে না।

পরিশেষে বলা যায় দুই ধরণের শ্রমিকই এই শহুরে জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে শহর পরিস্কার রাখতে বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, অন্যদিকে এই বিপুল জনসংখ্যা এবং আধুনিকতা বজায় রাখতে বাড়ি নির্মানও জরুরী। দুধরণের শ্রমিকদেরই ভাড়া বা ঠিকাদারীর অর্থনীতির উপর নির্ভর করতে হয়। এদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পর অনেক সময় শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। যারা নিয়মনীতি বানায় তাদের মর্জির উপর এদের জীবন এবং জীবিকা নির্ভর করে।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in

মহিলা ও শিশু অভিবাসীয় শ্রমিকদের উপর কলকাতায় একটি গবেষণা

—দেবারতি বাগচী ও সাবির আহমেদ

এই গবেষণাটি দুই শ্রেণীর মানুষের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। প্রথম গবেষকের বিষয় অভিবাসীয় মাহিলা কাগজকুড়ানীদের জীবন ও জীবিকা। দ্বিতীয় গবেষক সাবির আহমেদর বিষয় হল রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বাস করা অভিবাসীয় শিশুরা।

দেবারতি বলেছেন যে অভিবাসীয় শ্রমিক মানে আমাদের ধারণা যারা অন্য গ্রাম বা অন্য রাজ্য থেকে কলকাতা এসে বাস করে তারা। কেউ যদি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করে এবং বাস করে তাকে অভিবাসী বলা বেশ কঠিন। অন্যদিকে দেখা যায় যারা জনসাধারণের মধ্যেই বাস করে, যাদের আলাদা কোন বাড়ি ঘর নেই কিন্তু কলকাতাতেই জন্মগ্রহণ করেছে -- এ সকল মানুষকেও অভিবাসী আক্ষ্যা দেওয়া হয়। তাই ফুটপাতবাসী মানুষদের অভিবাসী বলা হয়। এই ফুটপাতেই বাস করে মহিলা কাগজকুড়ানীরা। এদের পেশা নিয়ে শুধু আলোচনা করলেই চলবে না, এদের অবস্থান বা থাকার জায়গা নিয়ে যথাযথ পর্যালোচনা দরকার কারণ তারা শহরের নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান বা ভাড়াবাড়িতে থাকে না।

শুরুতেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষের অভিবাসনের প্রকারের কথা এবং পরে কলকাতায় অভিবাসনের চিএও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে অভিবাসনের রীতিনীতি কিরকম এবং কলকাতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তার কী সম্পর্ক তাও বলা হয়েছে। কলকাতার পৌরসভা এবং আদমশুমারী থেকে লেখক তথ্যগুলো পেয়েছেন এবং সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এটা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তাও দেখেছেন। এর পর তিনি ১৯৭৩-৭৪, ১৯৮৬-৮৭ এবং ২০১২-১৩ এই তিনটি সময়ের ফুটপাত বাসীদের উপর তথ্য সংগ্রহ করছেন। এইভাবে তিনি গ্রাম এবং শহরের অভিবাসী মানুষদের উপরের তথ্য সংগ্রহ করেছন। তাদের মধ্যে কতজন রাস্তায় থাকে, কতজন ফুটপাতে বাস করে এগুলো তিনি দেখেছেন। এদেরকে বর্তমানে 'গৃহহীন' আখ্যা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কতজন কাগজ কুড়ানো বা অন্যান্য আবর্জনা কুড়ানোর পেশায় যুক্ত সেটা উনি দেখেছেন। এইভাবে এই গৃহহীন মানুষদের জীবন জীবিকা, দৈনন্দিন অবস্থা এবং সঙ্কটের প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন। অভিবাসনের রূপটি এখানে কিরকম এবং এরা নাগরিক হিসেবে কোনো পরিষেবা পায় কিনা তাও দেখেছেন।

আগেকার প্রচুর গবেষণায় দক্ষিণের শহরগুলির বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পদার্থের পুর্নব্যবহার এবং শহরের পরিস্কার পরিচ্ছনতার উপর অনেক তথ্য পাওয়া যায়। উত্তরের শহরগুলি ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায় যেখানে ১৮ দশকের পরে নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে ওই বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। তবে কলকাতায় এই ধরণের কাজের কথা খুব একটা শোনা যায় নি। কলকাতা শহরের বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার খুব অল্প তথ্য আছে। ১৯৮০ সালে ক্রিষ্টিন ফুরেডি এশিয়ার শহগুলিতে মানুষ যে বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার কাজ করে সেটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। মানুষ এই নোংরা বর্জ্য পদার্থ নিজেরাই বহন করে অন্য জায়গায় একত্রিত করে, এটি অনেক পুরানো রীতি। এটিকে কীভাবে শোষণমুক্ত করা যায় এবং অনেক বেশী মানুষের অংশগ্রহকারীতায় কীভাবে কাজ ভাগ করা যায় উনি লিখেছেন। বর্তমানে বিভিন্ন এন.জি.ও-রাও এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু কেউই অবস্থানগত বিষয়টিকে জোর দেয় না। এদের থাকার জায়গা নিয়ে কেউ

গুরুত্ব দেয় না। তাই লেখক এই কাগজ বা ময়লা কুড়ানীদের জীবন যাত্রার উপর জোর দিয়েছিন এবং তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এদের জীবনের নানা দিকগুলি ইনি তুলে ধরেছেন। এদের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং শ্রমের ধরণ হল মূল লেখার বিষয়। গবেষণটি মূলত তৃতীয় প্রজন্মের কাগজ কুড়াণীদের উপর করা হয়েছে যারা স্থায়ী অভিবাসী হিসাবে শহরে বাস করে। অনেকেই তাদের মায়ের সাথে কলকাতা শহরে এসে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রথমে তারা ভিক্ষা করে, পরে লোকের বাড়ী গিয়ে কাজ করে, তারপর এই কাগজ বা ময়লা কুড়োনোর পেশায় নিযুক্ত হয়। অনেকেই স্বামী মারা যাওয়া বা স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার পর এই শহরে আসে আর এই পেশায় নিযুক্ত হয়। তারা মনে করে লোকের বাড়ি কাজ করার চেয়ে এখানে অনেক স্বাধীনতা আছে। কাজ আর সময় দুটোতে তারা ভালোভাবে নিজেদের মত ভাগ করতে পারে এই পেশায়। কাজ এবং সময়ের সামঞ্জস্যতা থাকায় এটা ক্রমে মহিলাভিক্তিক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটাকে তারা স্বাধীনতা ভাবে আসলে সেটার সঙ্গে তাদের থাকার জায়গার একটা সুক্ষ্ম সম্পর্কে রয়েছে। তাদের মাথা গোঁজার ঠাই নেই। ফুটপাতেই তারা বাস করে, তাই এই 'স্বাধীনতা'।

বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই কাগজ কুড়ানীরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে তা লেখক দেখিয়েছেন। এর সাথে গৃহহীনতার সম্পর্ক কী তাও দেখা হয়েছে। কোন সময়ে এরা কাজ করে, এদের পরিবারে কে কে আছে, এরা কোথা থেকে এসেছে-- এগুলি এই কাজের বিষয়। এই গবেষণার মুল উদ্দেশ্য হল এদের থাকার জায়গা কিরকম এবং সেটার কোনও নির্দিষ্ট ধরণ আছে কিনা সেটি দেখা। এদের থাকার জায়গার সঙ্গে এদের জীবকার কি সম্পর্ক আছে? গৃহহীনতা নিয়ে যা কাজ হয়েছে তাতে থাকার জায়গার পরিকাঠামোগত বিষয়গুলি ভেবে দেখা হয় না। বাসস্থানের অধিকার নিয়ে যারা কাজ করে তাদের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। বাসস্থান দেওয়া মানে এদের উচ্ছেদ করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া নয়। এদের জীবিকার সাথে জড়িতে সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও বাসস্থানের সমস্যা গুলো বুঝতে হবে।

সাবির আহমেদের কাজের বিষয় হল গ্রাম থেকে শহরে আসা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের বসবাসকারী শিশুরা। দেখা যায় যে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অভিবাসীয় শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। এটি তাদের আশ্রয়, খাদ্য ও জীবিকার সন্ধান দেয়। গড়ে তিনজন অভিবাসীয় শিশু এই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে কাজের সন্ধানে আসে। তারা বেশীরভাগ কাগজ বা ময়লা কুড়ানোর কাজ করে। এই গবেষণাটিতে এদের বয়স গড়ে ১২ বছর। এদের ন্যুনতম বয়স ৪-৭ বছর, অধিকতম বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছর। এদের মাসিক আয় ৩৫০-৫০০ টাকা। তবে এরা সঞ্চয় করতে পারে না। এরা বিভিন্ন নেশা, খাবার দাবার এবং যৌন যোগে সংযোগে এই টাকা খরচ করে। এরা বেশীর ভাগই শিশু শ্রমিক। তাই এদের বিভিন্ন অত্যাচার ও শোষণের সম্মুখীন হতে হয়। এদের শারীরিক ও যৌন নিগ্রহের শিকারও হতে হয়। এরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এত শিশু এই অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এদের সমস্যাগুলি নিয়ে খুব বেশী আালোচনা হয় না। এই নিয়ে কিছু আইনকানুন থাকলেও তা এদের খুব একটা সুরক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে যে বিনা খরচায় পথশিশুদের শিক্ষার অধিকার দিতে হবে। বাস্তবে দেখা যায় প্রচুর ড্রপ-আউট বা মাঝ পথে স্কুল ছাড়া, স্কুলে পড়েইনি এমন শিশুর সংখ্যা বেশী। ৫০ শতাংশ শিশুকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করা হয় কিন্তু তারা বেশীর ভাগই কেউ লিখতে পড়তে পারে না। আশ্চর্যজনক ভাবে ৪০ শতাংশ শিশুরা মুখে মুখে খুব তাড়াতাড়ি হিসেব কষে দিতে পারে।

একটি এন.জি.ও. এই প্ল্যাটফর্মে থাকা শিশুদের উপর একটি গবেষণা করেছে। তাতে দেখা যায় ৭৮

শতাংশ শিশুর যারা পালিয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে তারা এই শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে বাস করে। তারা তপশীলি জাতি বা মুসলিম সম্প্রদায়ের। বেশীরভাগ শিশুর মা-বাবারা দিনমজুর হিসাবে কাজ করে—যেমন চাষবাসের কাজ, রাজ মিস্ত্রী, বিড়ি বানানো, কুলি, রিক্সাওয়ালা, মালি এবং গাড়ি চালকের কাজ করে। কেউ ভ্যান চালায়, মুদি দোকানে কাজ করে বা কলকারখানার কাজ করে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষের নিজস্ব ছোটো দোকান আছে। এই লেখাটিতে আহমেদ এই কম মাইনে পাওয়া, পরিবারকে সেভাবে আর্থিক সুরক্ষা দিতে না পারা, ছেলেমেয়েদের চাহিদা পূরণ না হওয়া এবং সেই অবস্থায় অনেক ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত—এই সব বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যে সব বাবা-মা ছোট ছোট দোকান চালান তারা আশা করেন যে, ছেলেমেয়েরা সেখানে অনেকক্ষণ সময় দেবে। সেটা ছেলেমেয়েরা পছন্দ করে না তাই অনেক সময় পালিয়ে যায়। এগুলি সামাজিক গঠনমূলক হিংসার (Structural Violence) একটি দিক।

শিয়ালদহ স্টেশনে প্রায় ৮০ শতাংশ শিশুরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসে। বাকীরা ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, আসাম, দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে আসে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বেশীর ভাগই কলকাতা এবং তার পাশ্ববর্তী জেলা থেকে আসে যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী। দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে সবচেয়ে বেশী শিশুরা আসে। উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিভিন্ন কারণে উচ্ছেদিত পরিবার থেকেও এই শিশুরা এসে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে বাস করে। ৪ শতাংশ শিশুরা বাংলাদেশ থেকে আসে। এদের মধ্যে ছেলে আর মেয়ের সংখ্যা কিরকম তা জানতে গেলে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ ছেলেরাই আসে এবং তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। মেয়েরা হারিয়ে গিয়ে, বাড়ি থেকে পরিত্যক্ত হয়ে বা পাচার হয়ে এখানে এসে ওঠে।

ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকেই এরা আসে কিন্তু এদের নিয়ে সেরকম নীতি বা প্রকল্প তৈরী হয়নি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষরা বলে যে শিশুরা এভাবে প্ল্যাটফর্মে বাস করতে পারে না। এই রীতিগুলোতে এদের নাগরিক হিসেবে অধিকারগুলির কথা প্রায় বলাই হয় না।

এই বাচ্চারা শিশু এবং কিশোরদের ন্যায় বিচার এবং সুরক্ষা নিয়ে সংশোধিত যে আইন (২০১০) আছে তার মধ্যেই পড়ে। (Juvenile Justice Act Amendment Act 2010)। এখানে এদের পুণর্বাসনের কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার আইন ২০০৯ (Right to Education,2009) শিশুদের যৌন অত্যাচার থেকে সুরক্ষা আইন ২০১২ (Protection of Children from Sexual Offences, 2012) শিশুদের বিভিন্ন সুরক্ষা প্রকল্প (Integrated Child Protection Scheme, 2001) - এই বিভিন্ন আইনগুলিকে এদের সুরক্ষার্থে ব্যবহার করলে এদের অনেক সুবিধা ও উন্নতি হবে।

ডিসেম্বর, ২০১৩-এ শিশুদের সুরক্ষার্থে রেলওয়ে দপ্তর কিছু নির্দিষ্ট মানের কার্য প্রণালী তৈরী করেছে। এই স্ট্যান্ডার্ড অপারোটিং প্রসিজিওরটি (SOP) দিল্লী হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরী হয়েছে এবং শিশুদের অধিকার নিয়ে যারা কাজ করে তারা এই নিয়ে লিখিত আবেদন করেছে। এই কার্যপ্রণালীতে এই শিশুদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে। কতজন আছে, কি অবস্থায় আছে এগুলিকে দেখা এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্তরের মানুষকেও এদের সুযোগ সুবিধা, যত্ন এবং সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাচ্চারা একা থাকুক বা স্টেশনে মা-বাবার সঙ্গে থাকুক সবার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

রেলওয়ে সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক মনে করে যে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম শিশুদের পক্ষে নিরাপদ ও অনুকূল স্থান। তাই শিয়ালদহ স্টেশনে একটি জায়গা (KIOSK) তৈরী হয়েছে যেখানে এইসব পালিয়ে যাওয়া বাচ্চারা স্টেশনে এসে পড়লে সহায়তা পাবে। এটিতে অনেক উপকার হলেও অন্য সমস্যাগুলির সমাধান কিন্তু এখনো হয়নি। কি করে এদেরকে শিক্ষার অধিকারের আইনের আওতায় আনা যায় সেটা দেখতে হবে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (National Skills Development Programme) এর আওতায় এদেরকে আনতে হবে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাগুলি যাতে এরা পায় সেটা দেখতে হবে। পরিশেষে বলা যায় যে বাজেট অধিবেশনেও যদি এদের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকে তাহলে এদের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজকর্ম করা যাবে যা তাদের হারানো শৈশবকে কিছুটা হলেও অক্ষুণ্ণ রাখবে।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp72.pdf

সেবামূলক অর্থনীতি এবং কলকাতায় নারীদের অভিবাসন

—মাধুরীলতা বসু

সমসাময়িক পুঁজিবাদীর যুগে নারী কেন্দ্রীক শ্রমের এক নতুন দিক হল সেবামূলক কাজ। এই গবেষণায় কলকাতার পটভূমিকায় সেবামূলক কাজ আর আয়ার কাজের কথা উল্লেখ আছে। তাদের কাজের ধরণ, তাদের যাতায়াত ও গতিবিধি—এগুলি নিয়ে কলকাতায় কয়েকটি গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানের বাইরে এই সেবামূলক কাজ হয়। নার্সরা হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে কাজ করে, আয়ারা বাড়িতে গিয়ে কাজ করে। যেসব আয়াদের দক্ষতা কম এবং প্রশিক্ষণ লাভ করেনি তারা বেশী মাইনে পায় না। আয়ারা সারাদিন মালিকের বাড়িতে কাজ করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এরা দৈনিক হিসাবে টাকা পায়। এরা বাচ্চা দেখা, বাড়িতে নার্সের কাজ, দৈনন্দিন ঘরের কাজ, যেমন রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার করা এবং সেবামূলক কাজগুলি করে। এইসব মহিলারা শহরতলী বা বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসে এবং এদের দৈনন্দিন কর্মজীবনের কথা অগোচরেই থেকে যায়।

ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারনীতি আসার পরে মধ্যবিত্ত সমাজই বাজার অর্থনীতির (Market Economy) শিরদাঁড়া হয়ে উঠল। এই সেবামূলক পরিষেবার মূল গ্রাহক হল মধ্যবত্তি সমাজ। এই সেবামূলক কাজগুলিকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হল নার্স যারা কলকাতার মত বড় শহরে এসে বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করে। অন্য দলটির মহিলারা গ্রামঞ্চল বা শহরতলী থেকে আসে। এরা মূলত অশিক্ষিত। এদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই তাই এরা হাসপাতালে আয়ার কাজ করে বা বাড়িতে বাড়িতে ঘরের কাজ করে। মধ্যবিত্ত মানুষ বাচ্চাদের আর বয়স্কলোকদের দেখাশোনার জন্য এদের সাহায্য নেয়। যে কাজগুলি আগে বাড়ির লোকেরাই করত এখন আয়ারই সেই কাজ করে। মহিলারা এখন কর্মরত আর যারা বাড়িতেও থাকে তাদেরকেও এই আয়াদের দরকার পড়ে ঘরের কাজ এবং বাচ্চা ও বয়স্কদের দেখাশোনার জন্য। যেসব মহিলারা আয়ার কাজ করতে আসে তারা হয় স্বামী পরিত্যক্ত, নয় বিধবা, নয় বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হওয়ার কারণে এই পেশায় আসে। তাই শ্রমের বাজরে খুব বেশী দরদাম এরা করতে পারে না। এটিকে বলা হয় দারিদ্রের নারীকরণ (Feminization of Proverty) বা মাতৃত্বের দারিদ্রকরণ (Pauperization of Motherhood) যা অধিকাংশ উন্নতদেশেই দেখা যায়।

ভারতবর্ষে দেখা যায় মহিলারা এবং শিশুরা শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয় যখন বাড়ির পুরুষদের আয় কোন কারণে কমে গিয়ে থাকে। বাড়ির আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেই বেশীরভাগ মহিলারা এই পেশায় আসে। কিন্তু নিজের বাড়িতে বউ এবং মায়ের দায়িত্বগুলিও তাদেরকে সমানভাবে পালন করতে হয়। তাই বাড়ির বাইরে অনেকক্ষণ কাজ করতে তাদের খুব অসুবিধা এবং পরিশ্রম হয়।

বেশীর ভাগ মহিলারা প্রত্যেকদিন যাতায়াত করে আয়ার কাজ করে। এই গবেষণায় ৪০ জন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৪ জন রোজ যাতায়াত করে। শিয়ালদহ এবং হাওড়া এই দুটি স্টেশন থেকেই বেশীরভাগ শহরতলী বা গ্রামাঞ্চলের ট্রেনগুলি চলে। এই সব মহিলারা ট্রেনে করেই যাতায়াত করে। শিয়ালদহ, বিধানগর, গড়িয়া, পার্ক সার্কাস, সল্টলেক (পূর্ব কলকাতা), যাদবপুর এবং নিউ

আলিপুর—এগুলি হলো এদের প্রধান গন্তব্য স্টেশন। ২০১১ সালে দেখা যায় যে সংস্থাগুলি (আয়া সেন্টার) আয়াদের চাকরী দেয় তারা আয়াদের বেতনের ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ প্রতি মাসে কেটে নেয়। ২০১৪ সালে এই মূল্য একটু কমেছে কারণ, আয়া সেন্টারগুলি এখন ভালোই রোজগার করে। আজকাল এই আয়া সেন্টারগুলি নিরপত্তার খাতিরে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রত্যেক আয়াকে এই আয়া সেন্টার গুলিতে দুটো পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও নিজেদের প্রমাণপত্র দিতে হয়। আগে এত কড়াকাড়ি ছিল না। প্রচুর অশিক্ষিত এবং অদক্ষ্য মহিলারা কলকাতায় কাজের সন্ধানে আসে তাই সেন্টারগুলির লোক পেতে অসুবিধা হয় না।

অনেক সময় দেখা যায় একটি সেন্টার থেকে নিযুক্ত হয়ে আয়ারা এক বাড়িতে কাজ করতে করতে বিশ্বাস অর্জন করে এবং তারপর সরাসরি সেই বাড়িতেই নিয়মিত কাজ করে। তাই সেন্টারকে কমিশন দিতে হয় না।

২০১৫ সালে কেন্দ্রের শ্রমমন্ত্রী (বিজেপি সরকার) বান্দারু দাত্তাতরেয়া বললেন যে, আইএলও (ILO) চুক্তির নাম্বার ১৮৯ কে ভারত সরকার সমর্থন করেনি। লোকের বাড়িতে সম্মানের সাথে কাজ করা নিয়ে এই চুক্তির অংশটি রয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের বক্তব্য যে প্রচলিত আইনের রীতিনীতি অনুযায়ী এটি তৈরি হয়নি। ২০০৮ সালে শ্রমিক সংগঠন দ্বারা সংরক্ষিত নয় সেইসব শ্রমজীবি মানুষদের সুরক্ষার কথা ভেবে আইন তৈরি হয়েছিল (Unorganised Sector Social Security Act, 2008)। এই আইনের আওতায় ঘরে কাজ করা শ্রমিকরা পড়ে। তারা বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সুরক্ষা পায় যেমন রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্প। সাম্প্রতিক কালে একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরী হয়েছে এই সব বাড়িতে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য। এখানে ফুল টাইম ও পার্ট টাইমের মজুরী নির্ধারিত হয়েছে। এরা যদি ফুল টাইমে কাজ করে বা নিয়মিত কাজ করে তাহলে তাদের ন্যুনতম মজুরী মাসে নয় হাজার টাকা হবে। বছরে ১৫ দিনের ছুটি এবং সুযোগ সুবিধাও পাবে।

শহরের আয়তন বাড়ছে। বাড়ছে মধ্যবিত্তের সংখ্যা এবং শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ক পর্যটন (Medical Tourism)। তাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে নার্সরা কাজ করতে আসছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নার্সদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা কমছে। কিন্তু বি.এস.সি পড়ানোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ২০০৪ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ৬ গুণ বেড়েছে। যেগুলিতে সাধারণ নার্সিং এবং দাই-এর (General Nursing & Mid Wifery, GNM) ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। সেগুলিতে ২০০৮ থেকে ২০১০-এর মধ্যে তিনগুণ বেড়েছে। গ্র্যাজুয়েট ও স্নানকোত্তর কোর্সগুলির সংখ্যা কমেছে। ৭৮ শতাংশ ছিল ২০০৪-এ আর ২০১০-এ তা ৬০ শতাংশ হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও রাজস্থানে স্নাতকোত্তর কোর্সগুলি আগের তুলনায় বেড়েছে।

কলকাতা পূর্বের বাইপাস এলাকার একটি বেসরকারী হাসপাতালে ১২০০ জন নার্স কাজ করে। তার মধ্যে ৬৫ শতাংশ অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছে। সবচেয়ে বেশী এসেছে কেরালা থেকে। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং মণিপুর থেকেও আসে। অনেক সময় মানব সম্পদের দপ্তর বিভিন্ন নার্সিং কলেজগুলিতে যোগাযোগ করে এই নার্সদের কাজ দেয়। অনেক সময় আবার বিভিন্ন রাজ্য থেকে নার্সেরা দল বেঁধে আসে তারপর বায়োডাটা দিয়ে হাসতাপালে কাজ খোঁজে। এম.এস.সি., বি.এস.সি, এবং জি.এন.এম. নার্সরাই এই কাজগুলি পায়। যারা নার্সিং সহায়ক এবং দাই-এর ডিপ্লোম কোর্স (Auxilliary

Nursing Midwifery Diploma Course, ANM) করে তারা সেভাবে নার্সের কাজ পায় না। আয়া হিসেবে তারা হাসপাতালে বিভিন্ন কাজ করে বা রুগীর সেবামূলক অন্যান্য কাজ করে। তবে এদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম।

কেরালার রিন্তা রাজু দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে কাজ করে। সেখানে ১০০ থেকে ২০০ নার্স কাজ করে যার মধ্যে ২৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসেছে। ২০ জন জি.এন.এম. কোর্সটি কেরালা থেকে করেছে। বাকিরা ওড়িশা এবং মণিপুর থেকে এসেছে। নার্সিং হোমগুলিতে আবার পশ্চিমবেঙ্গর বাইরে থেকে আসা নার্সদের সংখ্যা খুবই কম। উত্তর কলকাতার একটি নার্সিংহোমে দেখা গেছে সুন্দরবন, বনগাঁ ও অন্যান্য শহর থেকে মহিলারা নার্সদের সহায়িকা আর আয়া হিসেবে কাজ করে। বারাসাত আর বর্ধমানের নার্সিংহোমে দেখা গেছে যে অন্যান্য রাজ্য থেকে নার্স বা আয়া আসে না। পশ্চিবঙ্গের চাসবাসের উৎপাদিত ফসল খুবই কমে গেছে। তাই এই ধরনের কাজে মহিলারা খুব অল্প আয়ে নিযুক্ত হচ্ছেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নার্সিং বিভাগের অধ্যক্ষ বলেছেন যে অন্যান্য রাজ্য থেকে মহিলারা সরকারী হাসপাতালে নার্সিং-এর কোর্সগুলি করলেও তারা সরকারী হাসপাতালে নার্সের কাজ পায় না কারণ ত্রিপুরা ও মণিপুর থেকে আসা নার্সদের কোন কোটা সংরক্ষণ নেই। তাই এরা কলকাতায় বেসরকারী হাসপাতালে কাজ করে। এই সরকারী মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা নার্সদের সরকারী হাসপাতালে চাকরী মেলে এবং এদের মাইনে অনেক বেশী হয়। যারা বেসরকারী হাসপাতালে কাজ করে তাদের মাইনে অনেক কম। একটি সরকারী হাসপাতালের স্টাফ নার্স (Grade II)-এর মাইনে ৭১০০ থেকে ৩৭৬০০। এটি নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতার উপর।

অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় ভারতের মুদ্রার হার অনেক কম। তাই স্বাস্থ্য পর্যটন অনেক বেড়ছে এবং বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্লিনিগাল্‌স্, কলম্বিয়া, এশিয়া, ওখার্ড—এরা অনেক জমি নিয়ে হাসপাতাল এবং অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। যেমন আয়াদের থাকার জায়গা, ওষুধের দোকান, রেস্টুরেন্ট, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, বই-এর দোকান ইত্যাদির। আজকাল অনেক নার্সই বেশী উপার্জনের আশায় ইন্দোনেশিয়া, মালায়শিয়া, গালফ্-এর দেশগুলি এবং কানাডায় যাচ্ছে। তবে কলকাতা আসার কারণ শুধু উপার্জন বৃদ্ধি ছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে।

আরেকটি নতুন দিক হল সেবামূলক বিভিন্ন সংস্থার প্রবেশ যেমন পোর্সিয়া মেডিক্যাল, ইন্ডিয়া হোম হেলথ্ কেয়ার ইত্যাদি। এরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রুগীর সেবা শুশ্রূষার কাজ করে আর বাচ্চা বা বয়স্কলোকদের দেখাশোনার কাজ করে। হাসপাতাল থেকে যারা সদ্য ছাড়া পেয়েছে সেই সব রোগীদের জন্য বাড়িতে ডাক্তার, নার্স, ফিজিওথেরাপিষ্ট ইত্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এরা হাসপাতালের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত। আরেকটি সংস্থা 'দ্বীপ পরিষেবা' কলকাতার বাইরে থাকা বয়স্ক লোকদের বাড়ি গিয়ে পরিষেবা দেয়।

নার্সদের জন্য কলকাতা বিভিন্ন জায়গার সংযোগস্থল। কলকাতা থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজে যায়। কিন্তু আয়াদের জন্য কলকাতাই গন্তব্য স্থান। প্রথম বিশ্বের মহিলারা যখন নিজেদের কেরিয়ার বা

জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত তখন গরীব দেশের মহিলারা নানা জায়গা থেকে কলকাতায় এসে এই ধরনের সেবামূলক কাজ করে। তৃতীয় বিশ্বের মহিলারাই মূলত এই নার্স বা আয়ার কাজ করে এবং গরীব দেশ থেকে ধনী দেশগুলিতে কাজের সন্ধানে যায়। অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে কাজের সন্ধানে যাওয়ার বিষয়টি হলো আর এক ধরনের অভিবাসন।

তথ্য গুলি নেওয়া হয়েছে ঃ www.indiannursingcouncil.org থেকে।

সংক্ষিপ্ত গবেষণা
বিভাগ ২ : দিল্লী

রাজধানী শহর : আইন ও নীতির কিছু অসংগতিপূর্ণ বিষয়

—অমিত প্রকাশ

জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লীতে পরিচালনার জন্য বর্তমানে যে সকল নীতি ও আইন ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। এই পর্যবেক্ষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ দিল্লী একাধারে দেশের রাজধানী অন্যদিকে আবার কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল (Union Territory)। তাই এর ক্ষমতা ও কার্যকলাপগুলি বিভিন্ন সংস্থা দ্বারকা পরিচালিত। এখানে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শহরের উৎপত্তি, দারিদ্র এবং জীবন জীবিকার প্রশ্ন এবং এই রীতিনীতি গুলিতে অভিবাসীয় মানুষদের স্থান। উপরোক্ত বিষয়গুলি একটি অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করেছে এই দিল্লী শহরে। নগরোন্নয়ণ এবং পরিকল্পনার কিছু বিষয় অত্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ যা সাধারণ লোকের জীবনে সুযোগ সুবিধা এনে দিতে পারে না। এই পরিকল্পনাগুলি সরকার চালনা করে এবং সাধারণ মানুষের চাহিদার কথা মাথায় না রেখে তাদের খেয়ালখুশী মতো এবং সংরক্ষণশীলদের মাধ্যমে দিল্লীকে বিশ্বমানের শহর বানানোর চেষ্টায় মেতে থাকে। তাই সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে কেউ নজর দেয় না এবং গরীব মানুষদের অসুবিধার কথা কেউ ভাবে না। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় যে উৎপাদনমূলক উদ্যোগুলিকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং শ্রমনির্ভর কলকারখানা গুলির সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু দিল্লীর মাষ্টার পরিকল্পনা ২০২১-তে দেখা যায় এই শ্রমিক এবং অভিবাসীয় মানুষদেদর উপর অর্থনীতির উন্নয়ণের জন্য অনেকখানি নির্ভর করতে হয়।

শহরের নীতি ও আইনকানুন তৈরির সময় শহরের উৎপত্তি এবং শহর নির্মাণের অন্যান্য বিষয়গুলি মাথায় রাখা হয় না। শহরগুলির তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলো অন্যান্য জায়গা বা বসতির থেকে আলাদা। শহর মানে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তাই মিলিটারী বা সেনাদের প্রধান ঘাঁটি হলো শহর। দিল্লী হল রাজনৈতিক ক্ষমতার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্নায়ুকেন্দ্র। অনেক সময় দেখা যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে রীতিনীতি প্রয়োজন সেগুলো অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে।

দিল্লী একটি প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র ছাড়াও একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। গত দুশো বছরে শিল্পায়ণের রীতিনীতি বদলেছে। অনেক দ্রুত গতিতে শিল্পায়ণ হয়েছে এবং যার ফলে নগরোন্নয়ণের নানা দিক প্রকাশ পাচ্ছে। তাই দিন মজুরের সংখ্যা বেড়েছে এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে লেখক ইউ. কে-এর লন্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো শহরের কথা বলেছেন যেখানে সম্পদের আদিম সংগ্রহের নিদর্শন দেখা যায়। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক অধিকারের আন্দোলন, শহুরে রীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবধ্যতা—এইগুলিরও সাক্ষী এই শহরগুলি। দিল্লী শহরও অনেকটা এরকম। তাই এটিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ইন্টারনেটের ব্যবহারের ফলে দিল্লীকে এখন পরিষেবা অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে বলা যেতে পারে।

সারা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর ফলে শহরগুলিও তাদের চেহারা বদলায়। দিল্লী এখন রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের প্রাণকেন্দ্র। একটি প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মধ্যে শহরগুলিকে থাকতে হয়। এতে প্রশাসনিক কাজগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে হয় এবং সামাজিক বিচারগুলি পেতেও সুবিধা হয়। এছাড়া প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দিল্লী একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং উচ্চাকাঙ্খী শ্রেণিরা দিল্লীর মান বাড়াতে সাহায্য করে। কারণ এরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে এগিয়ে আছে। এরা শুধুমাত্র শ্রমজীবি মানুষ হিসাবে গণ্য হয় না। দিল্লীকে সুন্দর বানানোর ক্ষেত্রে, নতুন বাড়ি বা কলোনি বানানোর ক্ষেত্রে এবং নামীদামী জিনিস কেনার ক্ষেত্রে এদের অসীম ভূমিকা। কিন্তু গরীব অভিবাসীয় মানুষেরা হচ্ছে 'নিকাশী নালার' মতো। শহরের নোংরা, কোলাহল, ঝামেলা, দুশ্চিন্তা সব এদের মধ্যে বর্তমান। তাই এদের যেন কেউ গ্রহণ করতে চায় না।

সরকারী রীতিনীতি গুলির পরিকাঠামো বুঝলে এই সামাজিক বিচার ব্যবস্থা বুঝতে সুবিধা হবে। এখানে একটি শহরের নিরিখে জায়গা বা অবস্থার কথা বুঝতে হবে। বর্তমান যুগে শহরের সৌন্দর্যায়ন এবং মূলধন বাড়ানোর উদ্যোগে এই সুযোগ গুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে যা এই অভিবাসীয় মানুষদের জন্য ক্ষতিকর। ব্রিজ, উড়ালপুল, সপিংমল আর রাস্তা তৈরি হচ্ছে। শহরের আয়তন কমে আসছে। সামাজিক বিচারের পরিধিও কমে আসছে। তাই স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অন্যান্য পরিকাঠামো এবং কিছু বসতির সংখ্যা কমে আসছে।

উপরোক্ত পরিকাঠামোয় অভিবাসীয় মানুষদের সমস্যাগুলি বোঝা দরকার। এই রীতিনীতিগুলি যারা বানায় তারা ভাবে না অভিবাসীয় মানুষ বা শ্রমিকদের উপর এর প্রভাব কি পড়বে। এদের প্রতিনিধিত্বতা এবং বৈধতা নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে। তাও একটি শহরের আকাঙ্খিত ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এদের সমস্যার কথা পেছনে ফেলে আসতে হয়। তাই ভিন্ন মত পোষণের জায়গা ধীরে ধীরে কমে আসছে এই শহরে।

অভিবাসীয় মানুষেরা যদিও একটি শহরের অর্থনৈতিক অবস্থার বা চাহিদার 'ইঞ্জিন' তবুও এদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে এবং প্রতিনিধিত্বতার ও বৈধতার অভাবের কারণে এদের একটু উপেক্ষা করা হয়। আইনী রীতিনীতিগুলোতে এদের প্রাধান্য দেওয়া হয় না। বর্তমানে এদের সামাজিক কোনও অবস্থান নেই, কারণ এরা ভবঘুরে। বিভিন্ন মরসুমে এরা কাজ করে এবং এদের শৃঙ্খলা খুবই কম। তাই শহুরে আবহাওৰায় এরা মানিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু এই শ্রমিকরাই শহরের মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। লোকের বাড়ী কাজ থেকে বাড়ি নির্মাণ করা এদের মূল জীবিকা কিন্তু এই 'বিশৃঙ্খল, অবাঞ্ছিত এবং অকমর্ণ' মানুষদের এই শহরে কোন ঠাঁই নেই। তাই শহরের কোণায় বা 'শহুরে গ্রামে' এদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দিল্লীতে চাকরীর অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়, তাই মিডিয়াতে এবং নগরোন্নায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় শুধু শহরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি। সৌন্দর্যায়নের প্রকল্পের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি হল শহরকে সুন্দর করা, শহরের অবাঞ্ছিত এবং অনাকাঙ্খিত বস্তুগুলিকে সরানো। এই অবাঞ্ছিত মানুষদের মধ্যে রয়েছে অভিবাসীয় মানুষেরা। দ্বিতীয়টি হল—ঐতিহ্যমূলক স্থানগুলিকে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পণ্যে পরিণত করা এবং তৃতীয়টি হল দিল্লীকে বিশ্বব্যাপী শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। দিল্লীকে সুন্দর বানানোর উদ্যোগের ফলে অন্যান্য খাতে যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাধারণ মানুষের আবাসন এবং খাদ্যসংস্থান—এগুলির খরচ অনেক কমে গিয়েছে। অন্যদিকে দিল্লীকে আন্তর্জাতিক চেহারা দেওয়ার জন্য বড় বড় আবাসন এবং উচ্চমানের পরিকাঠামো বানানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এগুলির সাথে গরীব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। দিল্লীর 'মাষ্টার প্ল্যানে'ও উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন সৌন্দর্যায়ন, পরিবেশ এবং সংরক্ষণ, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা ভাবাই হয়নি।

এই গরীব অভিবাসীয় শ্রমিকদের রোজগার খুবই অল্প এবং অনিয়মিত। এদের দক্ষতা অল্প এবং এরা বিভিন্ন বস্তিতে বাস করে। সৌন্দর্যায়ন করার জন্য বেশীরভাগ সময় এদের বস্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাই এটা দিল্লীর ব্যর্থতা কারণ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যারা এই পরিকল্পনাগুলো করে তারা কেন্দ্রিয় নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং প্রযুক্তিগত বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। তাই সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোর কথা এরা মাথায় রাখে না। এছাড়া দিল্লী সরকার এবং কেন্দ্র শাসিত সরকার অফিস (Union Government) আর. এল. জি. অফিস—এদের অবস্থানগুলো বিভিন্ন জায়গায়। তাই সাধারণ মানুষের চাহিদার কথা সরকারের কাছে পৌঁছায় না। অবস্থানগত অসুবিধার কারণে সরকারের দায়িত্ববোধ কমে আসে আর জোর দেওয়া হয় দিল্লীর সৌন্দর্যায়নের দিকে। তাই বাড়ি তৈরীর খাতে বাজেটের পরিমাণ কমে যায়। গরীব অভিবাসীয় মানুষদের দিল্লীর একটি বে-আইনী অঞ্চল নাম 'জে.জে' এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কারণ গত পাঁচ বছরে এই বাজেট কমেছে। ২০১১-১২-তে ছিল ১৪%, ২০১৫-১৬-তে ৯%।

দিল্লীর নগরোন্নয়ন ও পরিকল্পনার ওপর সরকারের যে আধিপত্য রয়েছে সেখানে প্রাধান্য পায় শুধু সৌন্দর্যায়ন এবং দিল্লীকে বিশ্বমানের শহর বানানোর আকাঙ্খা, যা সংরক্ষণশীল মনোভাব, কেন্দ্রীয়করণ, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নততর প্রযুক্তিদ্বারা প্রভাবিত। সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গরীব শ্রমজীবি মানুষরা সেখানে অবাঞ্ছিত। তাই উৎপাদনমুখী কিছু ব্যবসাকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্রম নির্ভর শিল্পগুলির সংখ্যা কমতে থাকে। এই রীতিনীতিগুলিতে এই অভিবাসীয় মানুষদের সমস্যার কথা বলা হয় না। অথচ তারাই এই শহরের অর্থনৈতিক উন্নতির এবং পরিষেবা শিল্পের মূল কাণ্ডারী। এদের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব করার উপায় নেই এবং সরকার অনুমোদিত কলোনীতে এদের ঠাঁই নেই। শাসন ব্যবস্থা আর নগরোন্নয়নের রীতিনীতি না বদলালে এদের অবস্থা কোনো উন্নতি হবে না এবং সামাজিক রীতিনীতির কোনও পরিবর্তন হবে না।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp74.pdf

ভূমির সার্বভৌমত্ব জমি অধিগ্রহণ এবং অভিবাসীয় শ্রমিক

মিথিলেশ কুমার

এই লেখাটিতে জমি অধিগ্রহণ, অভিবাসীয় শ্রমিক ও নগরোন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অলোচনা হয়েছে। এখানে নাঙ্গাল দেওয়াত নামের একটি গ্রামের কথা বলা হয়েছে যেটি দিল্লী বিমান বন্দরের সীমানার মধ্যে পড়ে এবং হোটেল সেন্টুরের কাছে অবস্থিত। বিমানবন্দর সম্প্রসারণের সময় এই গ্রামটি নিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা জমির মালিকানা, সম্প্রদায় এবং স্বতন্ত্রতা—এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের ভাবতে বাধ্য করে।

১৯৭২ সালে 'সার্বজনিন উদ্দেশ্যে' (Public Purpose) এই গ্রামটিকে অধিগ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদ্দেশ্যটি হল ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং সেখানকার মানুষদের রঙপুরী পাহাড়ী গ্রামে বিকল্প জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদেরকে জমি ফেরত দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা হল এরকম—

	গ্রামের মানুষেরা যতটা এলাকা দখল করেছে (বর্গমিটার)	যতটা এলাকা 'AAI.' তাদেরকে বরাদ্দ করেছে (বর্গ মিটার)
১	০ - ৩২	২৬
২	৩৩ - ৪৮	৪০
৩	৪৯ - ৮০	৬৪
৪	৮১ - ১০০	৯০
৫	১০১ - ১৪০	১০০
৬	১৪১ - ১৮০	১৬০
৭	১৮১ - ২৫০	২০০
৮	২৫১ - ৩৫০	২৫০
৯	৩৫১ - ৫৫০	৩৫০
১০	৫৫১ - ৮০০	৪৫০
১১	৮০১ - ১৫০০	৫৫০
১২	১৫০০ ও তার বেশী	৬৫০

১৯৭২-৭৩ সালে একটি জরিপ (Survey)-এ এই তথ্য পাওয়া যায় যে নাঙ্গাল দেওয়াত কিছু পুরানো এলাকা (লাল ডোরা) এবং কিছু নতুন এলাকার সংমিশ্রণ। গ্রামগুলির ভাগ ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক (Colonial) ধারায় করা হয়েছে। রাজস্ব সংক্রান্ত নথি বা হিসেবগুলি নতুন এলাকার উপর করা হয়েছে। লাল ডোরা এলাকার নথি ছিল না। ক্ষতিপূরণের চুক্তি অনুযায়ী যারা জমিতে বসবাস করবে

এবং মূল বাসিন্দা হবে তারাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে নতুন জমি পাবে। সমস্যাটি হল যে গ্রামের বাসিন্দারা এই জমি সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলো ঠিকমতো মেনে চলেনি এবং নথিপত্রে জমির এই দৈনন্দিন পরিবর্তনের বিষয়টিও ধরা হয়নি। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে জমিতে উপরিকাঠামো (Superstructure) তৈরী করা, উত্তরসুরীদের জমি দান করা (যেখানে একটি করে জমি অংশ দেওয়া হত পুরানো ও নতুন এলাকা মিলিয়ে) এবং বিক্রি বা অন্য কিছুর বিনিময়ে জমি দান করা। তাই একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল কারণ জমির নথিপত্রের সাথে ওই জরিপের তথ্যের মিল ছিল না। দেখা গেল জরিপে একজনের নাম আছে কিন্তু নকসা মুস্তাজামিনে নাম নেই এবং উল্টোটাও ঘটলো। দুটো জায়গায় নাম থাকলেও দিল্লী হাইকোর্ট দেখল যে উপরিকাঠামো গড়ে ওঠার ফলে তাদের বিকল্প জমি দিতেও অসুবিধা হচ্ছিল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল যে জমি এবং তৈরী হওয়া কাঠামো এই দুটি আইনের চোখে আলাদা। এই পরিবেশটিকে হার্ভের শ্রেণী অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে গেলে এই কথা মনে রাখতে হবে। তবুও এই মোকদ্দমাধীন বিষয়গুলি অনেক সহজ কারণ জমি দলিল দেখতে বোঝা যায় যে কার নামে কতটা জমি রয়েছে। সমস্যাটি হল যেখানে এই মানুষগুলোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতাই গ্রাহ্য করা হচ্ছে না সেখানে জমি এবং জমির মালিকদের কিভাবে ঠিকমতো চিহ্নিত করা যাবে? এই গ্রামে বসবাসকারী দলিতদের ঠিক এই অবস্থাটাই হয়েছিল।

নাঙ্গাল দেওয়াত গ্রামের দলিতদের বসতি স্থাপন এবং পরবর্তীকালে উচ্ছেদ হল বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংমিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত। যেগুলি হল রাজ্য, নাগরিকত্ব, পরিচয় এবং শ্রম। এই ঘটনার সূত্রপাত ১৯৫৮ এ স্বাধীনতার ১০ বছর পরে যখন ১২২ জন দলিত এই নাঙ্গাল দেওয়াত গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল। এটি ছিল ঔপনিবেশিক পরবর্তী রাজ্যের জমি সংরক্ষণের একটি নীতি। তাদেরকে এই জমিগুলি দেওয়া হয়েছিল ব্যবসার জন্য। চাষবাস বা অর্তনৈতিক কাজকর্মের জন্য নয়। যে চারটি গোষ্ঠী এখানে বাস করতো তারা হল মাখবুজা জুল্লাহান, মাখবুজা চামারান, মাখবুজা কুমহারান এবং মাখবুজা আহলে। জমি দেওয়া হয়েছিল এই গোষ্ঠীগুলিকে, আলাদা করে কোন ব্যক্তিকে নয়। এই দলিতদের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে। যেই দেশ নাগরিকত্ব দিচ্ছে এবং যেই ব্যক্তিকে দিচ্ছে এদের মধ্যে কি সম্পর্ক? খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানে ব্যক্তির নাগরিকত্বের প্রশ্নটা আসছে না কারণ এখানে জমি দেওয়া হয়েছিল এই গোষ্ঠীগুলিকে, কোনও ব্যক্তিকে নয়। কে কতটা জমি পাবে এবং কোথায় পাবে তা এই গোষ্ঠীর মানুষরাই সিদ্ধান্ত নিত। এই জায়গাটি গভীরভাবে ভাবতে হবে কারণ এখানে জাতপাতের বিষয়টি উঠে আসছে। রাজ্যের সামজকল্যাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট জাতের মানুষগুলিকে গোষ্ঠী হিসাবে দেখা হত। ব্যক্তি হিসেবে দেখা হত না তাই রুঁশোর তত্ত্ব অনুযায়ী এই ''সামাজিক চুক্তির'' (Social Contract) পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই এটি ''হবেসিয়ান লেভিয়েথান'' তত্ত্বের মধ্যেও পড়ে না (Hobbesian Leviathan)।

এখানে সরকার তার রাজ্যে বসবাসকারী মানুষদের সঙ্গে দু' ধরনের নীতি প্রয়োগ করলেন। উঁচু জাতের মানুষেরা পেল নাগরিকত্ব এবং সম্পত্তির অধিকার। আর অন্য শ্রেণীর মানুষেরা নাগরিকত্ব পেল না। তাদের দেওয়া হল চাষ-বাস করার অধিকার আর অনুমিত সম্পত্তির অধিকার। সমস্যাটা তখনই দেখা দিল যখন রাজ্য এই মানুষগুলোকে তাদের গোষ্ঠী থেকে মুক্ত করতে চাইল। ক্ষতিপূরণের কথা যখন উঠল বলাই বাহুল্য যে উঁচু জাতের মানুষরা এই দলিতদের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতিপূরণ পেল। তিনটি সদস্য দিয়ে

কমিটি তৈরী হল যারা দলিতদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সুপারিশ করল। ''এই কমিটি বলল যে— ১৯৫৮ নথিপত্রগুলো হল গৌণ বা আনুষঙ্গিক। তাই নতুন করে ওই জমিগুলির জরিপ করা হবে যাতে বোঝা যায় ১২২ জন লোকের নামে কতটা জমি আছে। এই বিকল্প জমিগুলো তাদেরকেই দেওয়া হবে যাদের নিজেদের নামে জমি আছে ওই গোষ্ঠীর জমির মধ্যে। মৃত্যুর পরে তার উত্তরসূরীরা ওই জমি পাবে। ১৯৫৮-এ জমি দেওয়া হয়েছিল বলেই যে পরেও জমি পাবে এমনটা নাও হতে পারে। কিছু আনুসাঙ্গিক নথিপত্রও প্রমাণ হিসেবে দেখাতে হয়েছিল। যেমন 'বিদ্যুতের বিল'' ইত্যাদি। উচ্ছেদকারীদের একটি স্বস্তির কারণ ছিল এই যে ১৯৫৮-এ ওই জমিগুলিতে সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু ৫০ বছর বাদে সেই সংখ্যাগুলো সব মিলছিল না। তাই এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে একজন মানুষের দখলে জমি না থাকলেও তাকে যে উপেক্ষা করা হবে এমনটা নাও হতে পারে। তবে তাকে ওই গোষ্ঠীর জমির মালিক হতে হবে এবং তার খাসরা নম্বর থাকবে।'' এই নিয়মটি দিল্লী হাইকোর্ট তৈরী করল যাতে যে সব মানুষ ৫০ বছর ধরে ওই জায়গায় বাস করছে তারা যেন কোনওভাবে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত না হয় এবং বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজের ফলে তাদের যেন ঠিকমতো পূনর্বাসন হয়। তাই ওই ১২২ জনের মধ্যে যাদের নাম নথিভুক্ত ছিল কিন্তু যারা পরবর্তীকালে জমি বিক্রি করেছে বা জমির বদলে অন্য কিছু নিয়েছে তারা কোন বিকল্প জমি পেল না। সেরকম ভাবেই যারা ১৯৫৮-এর পরে ওখানে বসবাস করতো তাদেরকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল না কারণ তারা ওই জমির আদি বা মূল প্রাপক ছিল না।

আদালতের ব্যাপারে একটু সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দরকার, আইনি ব্যাখ্যা নয়। সম্পত্তির ক্ষেত্রে আদালত সবসময় একজন বৈধ ব্যক্তিকে বিবেচনা করে। সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কারণ, রাজস্বের নথিপত্রে ওই জমিগুলো কোনও ব্যক্তি বিশেষের ছিল না। জমিগুলো ছিল গোষ্ঠীর। তখন হরিজন এবং অনগ্রসর জন কল্যাণ সমিতি হাইকোর্টের কাছে একটি লিখিত আবেদন করল। মূল আবেদনটি কোর্ট নাকচ করে দিয়েছিল এই বলে যে বিকল্প জমি কোনও ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হবে না ওই গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে। ওই গোষ্ঠীই সিদ্ধান্ত নেবে বিকল্প জমিগুলো কাদের মধ্যে কীভাবে কতটা ভাগ হবে। কোর্ট এদের ব্যক্তি বা নাগরিক হিসাবে মানতে নারাজ ছিল। কিন্তু ওই সমিতি পুণরায় লিখিত আবেদন জানাল এবং তখন উপরোক্ত কমিটি গঠন হল এবং তারা তখন নাগরিকত্বের দাবী জানাল। এই রায়টি হল এই মানুষদের বৈধ পরিচয় এবং নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া প্রথম পদক্ষেপ। জরিপ এবং বিদ্যুতের বিল এই দলিতদের নাগরিকত্বের বিষয়টিকে আরো জোরালো করল। ১২২-এর মধ্যে ৫৯ জন নাগরিকত্বের নির্ণায়কগুলিকে পূর্ণ করেছিল। তাহলে প্রশ্ন হল, সরকার কেন তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করবে যখন আইনগত ভাবে তাদের নাগরিক হওয়ার অধিকার আছে? তপসীলি জাতির জনকল্যাণ সমিতি তখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই বলল যে দলিতদের প্রতি বৈষমমূলক আচরণ করা হয়েছে। এটা ভুল কথা নয়, কারণ ৫৯ জন যাদেরকে রঙপুরী পাহাড়িতে জমি দেওয়া হয়নি তারা ওই নাগরিকত্বের নির্ণায়কগুলি পূরণ করা সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছিল। উঁচু জাতের লোকেদের প্রাপ্য জমি ও তাদের বসবাস করা জমি দুটোর পরিমাণ প্রায় একই ছিল। তাই দলিত ও উঁচু জাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল। এখানে জমি এবং অন্যান্য তৈরী কাঠামোর মধ্যে পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ, জমির চেহারা বদল হয়েছিল এই কাঠামোগুলি তৈরী হওয়া ফলে।

এই উপরিকাঠামো তৈরী হয়েছিল আলাদা করে জমি কিনে বা সীমা লংঘন করে জমি দখল করে। তখন দলিতদের কাছে একমাত্র ব্যাপার প্রধান হয়ে দাঁড়ালো তা হল তাদের জমি। তবে এটি একরকম ব্যাখ্যা।

আরেকটি ব্যাখ্যা হল যে দৈনন্দিন জীবনে এই জমিগুলির নথি বা হিসেব রাখা হত না। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে সরকারী যা নিয়মকানুন আছে সেটাও দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় মানা হত না। এই দলিতদের কাজে জমি কোনও স্থায়ী বস্তু নয়। এটির বিভিন্নভাবে পরিবর্তন ঘটে। সরকার জমিকে সবসময় স্থায়ী সম্পত্তি হিসাবে দেখে। কিন্তু দলিতরা তাদের জমি বিক্রি করে বা তার বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করে। সরকারের সার্বভৌমত্তের কাছে এই পরিবর্তিত হওয়া জমির কোন গুরুত্ব ছিল না। তাদের কাছে জমি হল স্থায়ী ভূমির অংশ। এই স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয়তার বিষয়টি ছিল বলেই সরকার তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করত পারছিল। তাই জমির একটা রাজনৈতিক স্বত্ত্বা আছে সেটা এই ঘটনায় আরো প্রকাশ পেল। উচ্ছেদ, বাড়ী ঘর ধ্বংস করা এবং উৎখাত করা—এগুলো ছিল সরকারের ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার। এই বিশ্বায়ণের যুগে দলিতরা বিমানবন্দরের গোডাউন গুলোতে কুলীর কাজ করত। বিমানবন্দরে উঁচু জাতের লোকেরা ট্যাক্সি চালাত, বা জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া বা বিমানবন্দর থেকে অন্য কোথাও দিয়ে আসার কাজও করত। দলিতরা মূলত জিনিস সরবরাহের কাজ করত। তারা তখন হল এই সরবরাহ কাজের শ্রমিক। কিন্তু তাদের আরেকটি পরিচয় হল অভিবাসীয় শ্রমিক। বংশানুক্রমে কিভাবে সরবরাহ শ্রমিকরা ওই জমিতে বাস করে সে বিষয়ে একটা চিত্র পাওয়া যায় এই লেখাতে। সরবরাহ শ্রমিক তৈরী হওয়ার মূল কারণ হল সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতা, চাষবাস এবং বায়োপলিটিক্স (জীববিদ্যা ও রাজনীতির মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক সেই বিষয়টি মাইকেল ফুকোর সামাজিক তত্ত্বে ব্যবহার হয়েছে)। মূলধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পুঁজিটি স্থায়ী নয়, এটি পরিবর্তনশীল। এই শ্রমকে ব্যবহার না করে শুধু স্থায়ীরূপে সঞ্চয় করলে চলবে না। এটি গতিশীল এবং সবসময় এর পরিবর্তন হচ্ছে। সেই পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নয়। মানুষের অস্তিত্ব, পরিচয়, নাগরিকত্ব, বৈষয়িক, অবৈষয়িক সব কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। একটি দেশ বা রাজ্যকে শাসন করতে গেলে এই ধরনের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বলা যেতে পারে যে পরিবর্তীত পরিস্থিগুলিকে যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে তাহলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp74.pdf

দিল্লীর ''পরিষেবামূলক গ্রামে'' (Service Village) অভিবাসীয় শ্রমিকদের অস্থায়ী কাজ এবং জীবনের চিত্র

—ঈশিতা দে

দিল্লীতে কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে মূলত অভিবাসীয় মহিলারাই বাস করে এবং তারা মূল দিল্লীর সেবামূলক অর্থনীতির অংশ। এই গ্রামগুলিকে ''পরিষেবামূলক'' গ্রাম বলা হয়। এই লেখাটি তিনটে জায়গার অভিবাসীয় মানুষদের জীবনের ওপর লেখা। গুরগাঁও, নতুন দিল্লীর গৌতমপুরী কলোনী এবং ফরিদাবাদের একটি ডেরা। এই অভিবাসীয় মানুষেরা কত ঘন ঘন তাদের আদি জায়গা ছেড়ে এখানে আসে এবং এখানে মহিলাদের সংখ্যা কত এগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় নমুনা জরিপের (National Sample Survey) টেবিল এবং তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৯৯৩ আর ২০০৭-২০০৮এর মধ্যে ভারতবর্ষের শহরে এবং গ্রামে মহিলাদের অভিবাসন প্রচুর বেড়েছে (অভিবাসন বিষয়ক আদমশুমারী)। বিয়ের পর স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা যেমন প্রায়ই ঘটে। তেমনি প্রচুর মহিলা কাজের সন্ধানে অন্য জায়গায় যায়। তারপর কিছু আনুসাঙ্গিক বাড়ির কাজে তারাও জড়িয়ে পরে। এছাড়া পুরুষদের ধার শোধ করতেও সাহায্য করে। ধার শোধ করার সাথে বাড়ীর কাজের এই সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মহিলাদের জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তারা কীভাবে এই 'পরিষেবামূলক' গ্রামগুলিতে এসে বসবাস করে এবং নিজেদের গুছিয়ে নেয় এটিও আলোচনার বিষয়।

'পরিষেবামূলক' গ্রামের ধারণাটি লেখক রাজারহাট নিউ টাউনের একটি প্রকল্পের মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলি থেকে পেয়েছেন। একটি শহরের যখন উৎপাদনের কাজ হয় তখন নানারকম পরিষেবা লাগে এবং তা শুধুমাত্র শিল্প ভিত্তির অর্থনীতির অংশ নয়। সেখানে সেইসব গরীব শ্রমজীবি মানুষদের সাহায্য লাগে যারা সেই শহুরে অঞ্চলের বস্তি বা কলোনীতে বাস করে এবং যাদের কাজের চাহিদার থেকে কাজের সুযোগ অনেক কম। পরিষেবামূলক গ্রামগুলিকে বুঝতে হলে এই পুনর্বাসন প্রকল্পের কলোনী, ডেরা এবং বস্তিগুলির মধ্যের প্রশাসনিক সম্পর্কটিকে বুঝতে হবে। এখানে বেশীরভাগ অভিবাসীয় মানুষেরাই থাকে। তারা এই বস্তি, কলোনী, ডেরা এবং বে-আইনী আখড়াগুলিতে বাস করে এবং শহুরে জীবনের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে। একানে 'পরিষেবা আর গ্রাম' এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে কিভাবে এই অভিবাসীয় মানুষ এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া শহুরে জীবনকে প্রভাবিত করে। সেটি গ্রাম, শহর, রাজ্যের মধ্যে বা বাইরে—সব ধরনের অভিবাসনের ক্ষেত্রেই সমান। দিল্লী শহরের উপর অভিবাসনের কী প্রভাব তা এখানে দেখানো হয়েছে। অভিবাসীয় মানুষেরা শহরে এসে বিভিন্ন বস্তি, ডেরা, কলোনী ইত্যাদিতে বাস করে এবং তা থেকে কীভাবে এই পরিষেবামূলক গ্রামের উৎপত্তি হয় সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য এই সব মানুষেরা শহরের জায়গা দখল করতে বাধ্য হয়। এই জায়গাগুলোর নিজস্ব প্রশাসনিক রীতিনীতি এবং অধিকার আছে। তাই দিল্লী শহরে আসার পরে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে অভিবাসীয় মানুষেরা বাস করে।

একটি শহরের বিভিন্ন স্থানের সাথে পরিষেবার একটি সম্পর্ক আছে। যারা এই পরিষেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা শহরের একটু বাইরের দিকের অঞ্চলে বাস করে। দিল্লী এখন একটি দেওয়ালে মোড়া শহর হিসেবে চিহ্নিত হলেও সেখানে প্রচুর জমি জবরদখল করার ইতিহাস আছে। প্রফেসর আড্রিয়ান মেয়ার

(নৃবিজ্ঞানী) যখন স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত নিয়ে কাজ করেছিলেন তখন তিনি দিল্লীকে একটি এলাকা হিসাবে দেখেছিলেন। এলাকাটি মহানগরের কাছে এবং একটি সম্ভাবনাময় ও সম্পদপূর্ণ এলাকা। এই এলাকা নিয়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে যেটা মূল সমস্যা দেখা দিল তা হল একদিকে দিল্লীর প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং আরেকদিকে অভিবাসীয় মানুষদের প্রতিনিয়ত আগমন। দিল্লী শহরকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য এদের কাজকর্মের সুযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হল। কিন্তু এদের থাকার জায়গার ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। অনেকেই ভারত সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে থাকত এবং তারা মাঝে মাঝেই নিজেদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসত। মোদীনগর গ্রাম থেকে অভিবাসীয় শ্রমিকেরা সেভাবেই যাতায়াত করত।

যে সমস্ত জায়গা থেকে অভিবাসীয় শ্রমিকেরা আসত সেগুলোরও পরিবর্তন দরকার ছিল। দিল্লীর জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই দুটো উপায় ঠিক করা হল। সেটি হল গ্রামের সমষ্টি এবং ছোট শহর নির্মাণ করা। শরণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে এই দুটো প্রকল্প এবং প্রথম মাষ্টার প্ল্যানটি সফল হয়নি। এগুলো অসফল হওয়ার কারণ হল শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে মেরুকরণ। অভিবাসীয় এবং গ্রামের মানুষদের এই শহুরে পরিকল্পনাগুলির আওতায় খুব বেশী রাখা হত না। অভিবাসীয় মানুষ এবং তাদের বাসস্থান এই দুটি বিষয় সরকারের কাছে অত্যন্ত সমস্যার হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই অভিবাসীয় মানুষদের উপর দিল্লী শহর নির্ভর করত। কিন্তু এদের সুযোগ সুবিধার কথা কেউ বেশী ভাবত না। এদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিল এবং তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভোটের অধিকার। একজন মানুষের রাজনৈতিক অধিকার নির্ভর করে সে কোন জায়গায় জন্মেছে বা কোন অঞ্চলে বাস করে তার উপর। এই আঞ্চলিকতার প্রভাব পড়ে অভিবাসীয় মানুষদের উপর। সেই জন্য তারা নিজেদের পরিচয়পত্র তাদের গন্তব্য স্থান থেকে নিতে বাধ্য হয়। এইরকম একটি উদ্যোগ নিয়েছিল রাজস্থানের আজীবিকা অফিস। অভিবাসীয় মানুষদেরকে এরা পরিচয়পত্র দিল এবং এদের উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়েছিল রাজস্থানের শ্রম জীবিকা মন্ত্রক। যেইসব সংস্থা অভিবাসীয় মানুষদের নিয়ে কাজ করতে তারাও পরিচয় পত্র বানানোর উদ্যোগে সামিল হল। যেমন দিল্লীর এন.সি.আর.-এ এইরকম পরিচয়পত্র তৈরী হয়েছিল যেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের পরে পুণরায় নতুন করে করা যেত (Renew)। যারা এককভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজ করত তাদের জন্য এটা খুব সুবিধা হল। মহিলাদের বিয়ের পরে অন্য জায়গায় যাওয়া একটি প্রচলিত ঘটনা ছিল। এই মহিলা অভিবাসীদের জীবনে অনেক সমস্যা ছিল এবং বিয়ের পরে অভিবাসনের বিষয়টির মধ্যে অনেক জটিলতা ছিল।

অভিবাসীয় মানুষদের কাজে স্থায়িত্ব নেই। মহিলারা বেশীর ভাগ লোকের বাড়ী গিয়ে কাজ করে এবং অনেকেই সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। লেখক এই সেবামূলক অর্থনীতির উপর তিনটে জায়গায় কাজ করেছেন। গৌতমপুরীর পুনম বলেছে যে সেখানকার বেশীর ভাগ মানুষের মত তারাও অভিবাসীয় শ্রমিক। তার মা বাবা-র আদি বাড়ী লক্ষ্ণৌ এবং খুব অল্প বয়সে সে এখানে এসেছে। তার বাবা অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হিসাবে কাজ করে এবং তার মা লোকের বাড়ী কাজ করে। বিয়ের পর সেও কাজ শুরু করেছে। তার বয়স এখন তিরিশের কোঠায়। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। এরই মধ্যে সে সাতবার চাকরী বদলেছে। প্রথমে সে রুগীদের সেবা করত, তারপর সুরক্ষাকর্মী হিসেবে কাজ করতো। তারপর ঘর পরিষ্কারের কাজ, তারপর অঙ্গনওয়াড়ী সুপারভাইজার, তারপর ট্যাক্সি চালক এবং তারপর একটি সংস্থার জিনিস বিলি করার দপ্তরে চাকরী করত। লেখক এই সাক্ষাৎকারটি যখন নিয়েছিলেন তখন মেয়েটি একটি স্থানীয় ক্রেস খোলার পরিকল্পনা য়ি টাকা জামাচ্ছিল। পুনমের একটি বাচা যখন কাঁদছিল তখন তার শাশুড়ি এসে বলল যে

গৌতম নগরে তারা অনেক বেশী ভালো ছিল। তাদের বাড়িগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে গৌতমপুরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসে নতুন জায়গায় থাকতে তাদের বেশ অসুবিধা হয়েছিল। তাদের কাজের ধরন পরিবর্তন হয়নি নতুন জায়গায় এসে। পুনম এবং তার শাশুড়ি নির্মলা বলেছিল যে তারা নতুন জায়গাতে এসেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করা পছন্দ করত। পুনম বলল যে, নতুন জায়গায় এসে কারও বাড়ি গিয়ে কাজ করাটাকে তারা নিরাপদ বলে মনে করে কারণ সেই সময় মহিলারা বাড়িতে থাকে। এই 'কোঠি' বা বাড়ির কাজ অনেকটা নিজেদের ঘরকন্না কাজেরই মতন। তাদের কাজ কী রকম হচ্ছে সেটা সাধারণত বাড়ির মহিলারাই তদারকি করে। নির্মলা বলেছিল, তারা পরিবারিক সূত্রে জমাদার বা নোংরা পরিষ্কারের কাজ করত। গৌতম নগরে ভ্যানে করে গিয়ে সে আবর্জনা জোগাড় করে এবং পরিষ্কার করে। অন্য মহিলারাও একই ধরনের পেশার নিযুক্ত যেমন লোকের বাড়ি কাজ করা, নোংরা পরিষ্কার করা, কাগজ কুড়াণী এবং জমাদারণীর কাজ করে। তাহলে পুনম কী ব্যক্তিক্রম ?

পুনম বলল যে দরকার পড়লে অনেক কিছুই করতে হয়, কিন্তু সেই দরকারটা যে কী তা পুনম প্রথমে বলেনি। পরে অবশ্য বলল যে তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সে নানারকম কাজ করেছে। তবে ওই এলাকায় যেসব সংগঠনের কর্মীরা কাজ করে তারা বলল যে অনেক মহিলারাই যে কোনোও একটি কাজে বেশীদিন আটকে থাকে না। বাড়ীর কাজের ক্ষেত্রেও কেউ কেউ রান্না করতে পছন্দ করে, কেউ ঘরদোর পরিষ্কার করে, আবার কেউ রুগীদের সেবা করে। ওখানকার কিছু মহিলারা 'পোর্সিয়া'র কাছে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। এই সংস্থা মূলত বৃদ্ধ মানুষদের সেবা ও শুশ্রুষার কাজে নিযুক্ত, এভাবে তারা শ্রম অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হয়।

এই মহিলাদের শ্রমজীবন স্থায়ি নয়। এরা দক্ষ এবং অদক্ষ্য দুই কাজই করে এবং এদের জীবিকার ধরন কয়েক বছর অন্তর বদলায়। লেখক বলেছেন যে, ২০ বছর ধরে এদের জীবনযাত্রা দেখলে বোঝা যাবে যে, এরা কতবার এবং কি ধরনের পরিবর্তন করে তাদের কাজের ক্ষেত্রে। তারা ঘরের কাজ থেকে শ্রম বাজারের দিকে এগিয়ে চলে। তারা কখন ঠিক করে যে বাড়ির কাজ করবে, কখনই বা তারা শ্রমনির্ভর অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে পাদর্পণ করবে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে 'অন্তরঙ্গতার' বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে, এইসব মহিলারা কী ধরনের জাগয়ায় কাজ করবে এটা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে এরা লোকের বাড়ি গিয়ে কাজ করে। এই অন্তরঙ্গতার সম্পর্কটি সেবা মূলক শিল্পের একটি অন্যতম দিক। অভিবাসীয় মহিলাদের শ্রম নির্ভর অর্থনীতির একটি মূল উপাদান হল শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণ এবং তাদের অন্তরঙ্গতা। এই অন্তরঙ্গতার ব্যবহার সবসময় ঠিক হয় না এবং তা সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। বিশ্বায়ণের যুগ অনেকটাই 'পুঁজিনির্ভর'। তাই এই অন্তরঙ্গতার বিষয়টি বর্তমান যুগের সামাজিক নিরিখে বুঝতে হবে। কাজের জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এখানে বৈষম্যমূলক আচরণও লক্ষ্য করা যায় যেমন জাতপাত, ধর্ম, পবিত্রতা এইসব বিচার করে অনেকে রান্নাঘরের কাজ কর্ম করায়। তাই বাড়ি এবং কাজ এই দুটোকে আলাদা ভাবা হয়। এই লেখাটিতে বোঝা যাবে কেন মহিলারা এত বেশী অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত হয়। তাদের পরিবারের জন্য তারা এই পথ বেছে নেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কেরও সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে অস্থায়ী কাজকর্মে নিযুক্ত মহিলা অভিবাসীয় শ্রমিকদের জীবনের সমস্যার কথা নানা ভাবে ফুটে উঠেছে।

পুরো লেখাটি দেখুন ঃ http //www.mcrg.ac.in/pp74.pdf

সংক্ষিপ্ত গবেষণা
বিভাগ ৩ : মুম্বাই

মুম্বাইয়ের গৃহহীন অভিবাসীয় মানুষ ঃ শহরের মধ্যে তাদের জীবন ও শ্রমের বর্ণনা

—মণীশ কে. ঝা এবং পুষ্পেন্দু

এই লেখাটিতে মুম্বাই শহরে অবস্থিত অভিবাসীয় মানুষদের জীবনের কথা বলা হয়েছে। একটি শহরের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও কাজকর্ম বজায় রাখার ক্ষেত্রে এদের অপরিসীম ভূমিকা। এরা তাদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে শহরের উপর নির্ভর করে। গ্রাম থেকে শহরে কাজের সন্ধানে আসা ভারতবর্ষের এক প্রচলিত রীতি। মুম্বাইকে বিশ্বমানেরূহর বলা হয়। সারা দেশ থেকে প্রচুর অভিবাসীয় মানুষ কাজের সন্ধানে মুম্বাই শহরে পাড়ি দেয়। শহরে এসে তারা কোনও আইনি নিয়মকানুন মেনে তৈরী হওয়া বাড়িতে থাকতে পারে না। তাই তারা বাধ্য হয় ফুটপাথে, বস্তি বা কাজের জায়গাতেই থাকতে। বলাই বাহুল্য এগুলিকে বাড়ি বলা যায় না। তাই তারা গৃহহীন। এই গৃহহীনতার সংজ্ঞা পাওয়া যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের চুক্তিতে। ১৯৮৭-কে গৃহহীনদের আশ্রয় দেবার আন্তর্জাতিক বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে গৃহহীন মানুষ মানে যে শুধু যার গৃহ নেই তা নয়, সেই গৃহ বা বাড়িতে যদি যথাযথ আশ্রয় না থাকে বা মানুষের সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়ণের জন্য যা প্রয়োজন তা না থাকে তাহলেও সে গৃহহীন বলে গণ্য হবে, এছাড়া বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সুরক্ষা, খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া, শিক্ষার সুযোগ আছে কিনা, স্বাস্থ্যকর কিনা, জল আছে কিনা, কাজের সুযোগ আছে কিনা—এই বিষয়গুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখায় মুম্বাই শহরে গৃহহীন মানুষদের অসহায়তা, গৃহহীনতা, অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার কথা বলা হয়েছে।

২০০১-এর আদমশুমারিতে বলা হয়েছে যে মুম্বাইয়ের ১১.৯৭ (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) সংখ্যার মধ্যে ৪৫.১৮ মিলিয়ন বা ৪৭.৩% হচ্ছে অভিবাসীয় মানুষ। গ্রাম থেকে আসা অভিবাসীয় মানষদের সংখ্যাই বেশী। দুই তৃতীয়াংশ থেকে তিন চতুর্থাংশ মানুষের কোন দক্ষতা নেই বা খুব অল্প দক্ষতা আছে। তারা খুব ছোটোখাটো কাজের সঙ্গে যুক্ত। অনেকে আবার বেকার। এমন অস্থায়ী কাজকর্মের সুযোগ অনেক বেড়েছে। সেইসব জায়গায় বেশীরভাগ অভিবাসীয় শ্রমিকরাই নিযুক্ত হচ্ছে। একদিকে তাদের খুব অল্প আয় তাই তারা দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। অন্যদিকে তারা বস্তিতে বা ফুটপাথে থাকতে বাধ্য হয়। কোনও আইনী বৈধতা সম্পন্ন জায়গায় তারা থাকতে পারে না। ২০০১-এ মুম্বাইয়ের ৫৪% মানুষ বস্তিতে বাস করত। তারা শহরের ৬% জায়গায় বাস করত। তাদের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক ছিল। ২০০১-এর আদমশুমারিতে দেখা যায় যে গ্রেটার (বৃহত্তর) মুম্বাইয়ের ৩৯,০৭৪ জনসংখ্যায় ১১,৭৭১ বাড়ি (HH) ছিল। এছাড়া মুম্বাই শহরে এবং মুম্বাই শহরের বাইরে গৃহহীন মানুষদের সংখ্যা ছিল ২৪,০০০ এবং ১৫,০৭৪ আর বস্তির সংখ্যা ছিল ৭১৮৪ এবং ৪৫৯১। গৃহহীন মানুষদের সঠিক মূল্যায়ণ এখানে করা হয়নি। বাস্তবে এই তথ্যের চেয়ে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। যা প্রায় ১.৫ লক্ষ।

১৯৯১ সালে নয়া উদারনীতির ফলে যে অর্থনৈতিক নীতিগুলি তৈরী হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল উদারনীতিকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়ণ। তখন শহরের উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর মুম্বাইয়ের প্রকল্পটি স্থাপিত হল। নয়া উদারনীতি ও মুম্বাইয়ের নগরোন্নায়ন এই প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য। উন্নয়মূলক অধিকারের হস্তান্তর (Transferable Development Right) করা এবং ফ্লোর স্পেস ইন্ডেক্স (বাড়ির জমির

অনুপাতে বাড়ির মেঝের মাপ) এই দুটি বিষয় এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল বাজার নির্ভর অর্থনীতির পরিকল্পনার হাতিয়ার। পূর্বে যেসব জমিতে শিল্প হত সেগুলিকে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছিল। বস্তির উন্নয়ন ও বস্তিতে পুণর্বাসনের সাথে এই উন্নয়ণমূলক অধিকারের হস্তান্তরের সম্পর্ক আছে।

জমিগুলিতে নানারকম বাড়ি তৈরি ও পরিকাঠামো তৈরীর কাজ হত। তাই সরকার গরীবদের পুনর্বাসন দেওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হল। উৎপাদনমূলক কাজকর্মগুলি মুম্বাই শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল এবং শহর থেকে বস্তিগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করত এবং টাকা দিত যেমন মুম্বাই শহরের যানবাহনের প্রকল্প (Mumbai Urban Transport Project) এবং মুম্বাই শহরে পরিকাঠামোর প্রকল্প। (Mumbai Urban Infrastructure Project) । তখন প্রচুর বস্তি উচ্ছেদ হল এবং বস্তিবাসীদের স্থানান্তরিত করা হল। অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়ল। ২০০১ সালে বস্তির উপর একটি আইন পাশ হয়েছিল যেখানে ১৯৯৫-এর পরে আসা বস্তিবাসীদের দাবীগুলো আইনী বলে মানা হল না। ২০০৭ সরকার শহুরে জমির সীমা বিষয়ক আইনটি (Urban Land Ceiling Act) রদ করে দিল। যেটি জওহরলাল নেহরুর জাতীয় ও শহরের পুণরায় নির্মাণ করার লক্ষ্যের (Jawaharlal Nahru National Urban Renewal Mission) একটি অংশ ছিল। ২০০৫-এ বড়বাড়ী এবং আবাসন তৈরীর ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশ থেকে লগ্নী আনা হয়েছিল (Foreign Direct Investment)। দৈনন্দিন পরিষেবাগুলির বেসরকারীকরণ হল এবং পৌরসভার কাজগুলিও বাইরে থেকে লোক এনে করা হতে লাগল। উপকূল অঞ্চলগুলির সীমা পরিবর্তন হল এবং বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করার আইনটিও রদ হয়ে গেল। ২০০৩-এ একটি বিশ্বমানের সংস্থা নাম ম্যকিনসে এ্যান্ড কোম্পানী মুম্বাইয়ে বিশ্বমানের শহর বানাবার একটি প্রকল্প তৈরী করল। সরকার সেটিকে অনুমোদন করল। এর আদলে ২০০৩-এ তৈরী হল মুম্বাইকে বিশ্বমানের শহরে পরিণত করার প্রকল্প। এভাবে মুম্বাইকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হল। সেখানে বিশ্বমানের পরিকাঠামো থাকবে, নাগরিকদের সুবিধার জন্য নানারকম পরিষেবা থাকবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা থাকবে। পুরো প্রজেক্টের খরচ ৪০ বিলিয়ান ডলার (১,৮২,৬০০ কোটি)। দশ বছর ধরে এটির কাজ চলবে। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছিলো বেসরকারী বিনিয়োগ। মুম্বাইকে বিশ্বমানের শহর বানানোর যে লক্ষ্য তার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল ৬০ শতাংশ বস্তি অধ্যুষিত এলাকা উচ্ছেদ করে সেই জায়গাগুলিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা।

২০০৪-২০০৫-এ ৯০,০০০-এরও বেশী বস্তি উচ্ছেদ হয়েছিল। তারপর থেকে বস্তি ধ্বংস করার ঘটনা প্রায়শই ঘটতে লাগল। ১৯৯৫-এর আগে থেকে যারা বস্তিতে বাস করত সরকার থেকে তাদের বিকল্প বাড়ি দেওয়া হল যেটা ২২৫ বর্গফুট জায়গায় ছিল। এরকম এক জায়গায় শহরের জলাভূমির কাছে অনেক বস্তি স্থাপন করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৫-এর পরে যারা বস্তিতে এসেছিল তারা গৃহহীন হয়ে গেল। বসতির অধিকার একটা প্রধান মানবধিকার যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উল্লেখিত আছে। মানবাধিকার বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (International, Economic, Social and Cultural Rights) বিষয়ক চুক্তিতে বলা হয়েছে যে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের একটি প্রধান চাহিদা হল বাসস্থান। এই লেখাটিতে গৃহহীনতার বিষয়টির রাজনৈতিক দিক নিয়েও কথা বলা হয়েছে। এখানে সরকার ও সুশীল সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিংসা, উচ্ছেদ, নিরাপত্তাহীনতা, ব্যক্তিগত জায়গার অভাব,

জীবন জীবিকার সমস্যা—এই সমস্ত বিষয়গুলিও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

নগরায়ণের ফলে শহরের জায়গাগুলো ভাঙতে থাকে এবং পৃথকীকরণ দেখা যায়। যার ফলে অধিভাসীয় মানুষেরা গৃহহীন হয়ে পড়ে। উদার অর্থনীতির ফলে মধ্যবিত্ত মানুষদের ধন সম্পতি বৃদ্ধি পেল। সামাজিক অবস্থার উন্নতি হল এবং রাজনৈতিক অংশ গ্রহণকারীতাও বাড়ল। প্রভাবশালী মানুষেরাই নতুন নাগরকিত্বের সুযোগ পেল। এইসব ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষেরা জনসাধারণের জায়গার উপর দাবী করল। যার ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু গৃহহীন মানুষ এবং হকারদেরকে উচ্ছেদ করা হল। চার্চগেট স্টেশনের কাছে ক্রুগ ময়দান এলাকার গৃহহীন মানুষদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, স্থানচ্যুত হওয়া, উচ্ছেদ, হিংসার শিকার হওয়া, অসম্মান এবং নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া—এই সব বিষয় নিয়ে এই লেখাটিতে আলোচনা হয়েছে।

১৯৯১ সালে বৃহত্তর মুম্বাইয়ের উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী একটি নীতি তৈরী হয়েছিল। এই নীতি অনুযায়ী বহু সংরক্ষিত জমিতে তারা জিমখানা, ক্লাব, স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, আমোদ প্রমোদের জায়গা, খেলার জায়গা, বাগান ও পার্ক তৈরী করার পরিকল্পনা করেছিল। মুম্বাই শহরের ঐতিহ্যসংরক্ষণ কমিটি (Mumbai Urban Heritage Conservation Committee) এই প্ল্যানটির অনুমোদন করেছিল। এই পরিকল্পনাটি ছিল একটি এন.জি.ও. ট্রাস্টের যার নাম 'সবুজ পরিবেশ ও জমি' (Organisation for Verdant Ambienece and Land)। এই ময়দানটি ২০১০-এর ২৪শে জুন জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। এটিকে বিনোদন মূলক পার্কে পরিণত করা হল যেখানে জগিং-এর জায়গা, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, গাছ, ফুলের সারি, ঝর্ণা, পানীয় জল, বয়স্ক লোকেদের বসার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন নামজাদা ব্যক্তি, সংরকক্ষক, পরিবেশবিদ, শহরের স্থাপত্য নির্মাণকারী, ইতিহাসবিদ্ এবং বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের কর্মীরা এই পার্কটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। কিন্তু পার্কটির ভেতরে বহু ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর ছিল এবং হকারদের থাকার জায়গা ছিল। এরা ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই জায়গায় বাস করতো। ২০০৩-এ মুম্বাই হাইকোর্ট হকারি নিষিদ্ধ করেছিল। এদের মধ্যে ছিল রজনী। সেও বেআইনীভাবে এখানে বাস করত এবং পার্কটি তৈরী হবার ফলে তাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। নাগরিকত্বের অধিকার পায় না বলে অভিবাসীয় মানুষদের যে কত অসুবিধা হয় তা সে বলেছিল। এখানেই সে সারাজীবন বাস করেছে কিন্তু ৯ বছর আগে এই পার্ক তৈরির সময় তাকে বের করে দেওয়া হয় এবং সে ফুটপাথে থাকতে বাধ্য হয়। ২০০৬-এ তাদেরকে একটি কাগজে সই করতে বলা হয় যেখানে লেখা থাকে যে সরকার থেকে বিকল্প জায়গা দেওয়া হবে খুব অল্প সংখ্যক পরিবারকে যার মধ্যে তার ভাইও আছে। তাদেরকে মানখার্দ বলে একটি জায়গায় বাড়ি দেওয়া হয়। এই কাজটি করেছে স্পার্ক (Spark) নামক একটি এন.জি.ও.। তারা ময়দান এলাকায় রেলওয়ে অফিসের সামনে ফুটপাতটিতে থাকত। অনেক সময় ওভাল ট্রাস্ট (Oval Trust) থেকে বলা হত যে পলিথিন ও লোহার রডও জবর দখল করে লাগানো এক প্রকার থাকার জায়গা তখন সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে সাহায্য চাইত। কিন্তু পুলিশেরা গরীব মানুষের কথায় কান দিত না।

মুম্বাই পূর্ব ওয়ার্ড শিবাজীনগরে বস্তিটি পড়ে। এই ওয়ার্ডের ৭৭.৫ শতাংশ মানুষ বস্তিতে বাস করে। ১৮৭৫ সাল থেকে বহু উচ্ছেদকারী মানুষ এখানে পুণরায় বসতি স্থাপন করেছে। নগরায়ণ এবং পরিকাঠামো তৈরির ফলে বহু বসতি ধ্বংস করা হয়েছিল যার মধ্যে নারিমান পয়েন্ট অঞ্চলের বস্তিও ছিল।

এই উচ্ছেদ থেকে পুণর্বাসনের প্রক্রিয়াটি খুব কঠিন ও কষ্টকর ছিল অনেকের পক্ষে। তাদের পুণর্বাসনের জায়গাটির কাছে প্রচুর আবর্জনা ফেলা হত। প্রত্যেকদিন হাজার টনেরও বেশী এখানে নোংরা আবর্জনা ফেলা হত এবং বহু কাগজকুড়াণীদের জীবিকা এর উপর নির্ভর করত। ওই এলাকায় এই শহরের কসাইখানাও অবস্থিত ছিল। এই বস্তিগুলি ছাড়াও বহু অভিবাসীও এবং উচ্ছেদিত মানুষ বাধ্য হত ঐ এলাকার জলাভূমিতে থাকতে। সেই জায়গাটির নাম ছিল ইন্দিরা নগর যেটি দেওনার এলাকার কাছে। সেটিকে অবৈধ বস্তি বলা হত। ইন্দিরা নগরের বাসিন্দরা এমনকি বাচ্চারাও নোংরা তোলার কাজ করত বছরের পর বছর। তরা জলাভূমির ধারে টিনের শেড আর ত্রিপল লাগিয়ে বাস করত। রাস্তাঘাট খুব নোংরা ছিল। নর্দমায় সবসময় নোংরা জল জমা হত। ওখানকার বাসিন্দারা তাদের কাজের এবং থাকার অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা বলত। তাদের কাজের স্থায়িত্ব ছিল না তাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবৈধ ভাবে সাধারণ সুযোগ সবিধাগুলো পেতে হত। বছরে তিনবার তাদের আশ্রয়গুলি বুলডেজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হত। তাদের জীবনের নানা ওঠাপড়া সংগ্রাম, দরকষাকষি এবং অধ্যবসায়ের সাথে ছিল উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ভয়। কাগজ কুড়িয়ে তাদের সেরকম আর্থিক আয়ও হত না। তারা মুম্বাই পূর্ব ওয়ার্ডের মধ্যেও পড়ত না। সেই জন্য ইন্দিরা নগর জায়গাটি ছিল এই অভিবাসীয় মানুষদের দারিদ্র ও অসহায়তার নিদর্শন।

সাফিনা একজন ৪০ বছরের মুসলিম মহিলা। সে তার স্বামী, দেওর এবং ৫ সন্তানের সাথে ইন্দিরা নগরের পূর্ব দিকে থাকত। বাড়ির প্রাপ্তবয়স্করা দিনমজুরের কাজ করত এবং মাঝে মাঝে কাগজ কুড়নোর কাজও করত। তারা সবাই একটি (10'X12') ঘরে বাস করত। সেটি টিনের চালের তৈরী, ছাদ ও দেওয়ালও টিনের এবং অল্প কাঠের অংশ লাগানো রয়েছে। টিনের দরজা এখনো লাগানো বাকি। পাকা ছাদ না থাকায় তাদের ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না। ঘরে জিনিস বলতে ছিল কিছু বিছানা, বড় মাদুর, কেরোসিন তেলের স্টোভ, এ্যালোমিনিয়ামের বাসন, জল রাখার জ্যারিকেন, বালতি, বালিশ, বাক্স এবং কিছু জামা-কাপড়।

ঘরের একদিকে জল রাখার জায়গা যা ব্যবহার হয় রান্নাবান্না, বাসনকোসন ধোওয়া এবং চান করার জন্য। ঘরের বেশীরভাগ কাজই জনসম্মুখে করা হয় কারণ, সাধারণ মধ্যবিত্তের যে পারিবারিক/ব্যক্তিগত আশ্রয় আর গোপনীয়তা থাকে এদের তা নেই। সাফিনার বাচ্চারা বেশীরভাগ সময় শ্বাসকষ্টে ভোগে। কারণ, জায়গাটা ধোঁওয়ায় ভর্তি। ডাক্তার বলেছেন এই জায়গা বদলাতে হবে। বস্তিতে থাকা বা ফুটপাথে থাকা অন্যান্য লোকেদের মত সাফিনারাদেরও আধার কর্ড, বি.পি.এল. কার্ড, প্যান কার্ড এবং জন্মের শংসাপত্র আছে। সাফিনা খুবই প্রাণবন্ত ও কর্মঠ মহিলা। সে স্থানীয় একটি এন.জি.ও. অফিসে এই বস্তিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এই বস্তিতে জলের কষ্ট। তাই ট্যাংকার থেকে জল কিনতে হয়। প্রাপ্তবয়স্করাই শুধুমাত্র শৌচাগার ব্যবহার করে। বাচ্চারা খোলা রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করে। এলাকায় একটি বেসরকারি শৌচালয় আছে যা ব্যবহার করার জন্য প্রতি জনকে দুই টাকা করে দিতে হয়। এদের সবসময় বস্তি থেকে উচ্ছেদ হবার ভয় তাড়া করে বেড়ায়। সাফিনা বলে সরকার বস্তিবাসীদের জলাভূমিগুলো মাটি দিয়ে বোজাতে বলেছে এবং তারপর ওই জলাভূমিতে বস্তিবাসীরা ঝুপড়ি স্থাপনের কাজ করেছে। ভবিষ্যতে এই বাসস্থান থেকেই সরকার তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে। বি.এম.সি. থেকে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটি বছরে দুই থেকে তিনবার হয় যখন তারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে এই ঝুপড়িগুলিকে গুঁড়িয়ে ফেলে। বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয়

জিনিসগুলিও এর সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। নোংরা আবর্জনা ফেলার এলাকা থেকে তারা আবর্জনা সংগ্রহ করে। ওইখান থেকে নানারকম ব্যবসার সম্ভাবনা তৈরী হয়। এই মানুষেরা ভাবে যে এদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে 'সাহেব' না হলে এদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে না। কিন্তু এই সম্ভাবনা খুবই কম। বংশপরম্পরায় তারা এই কাজ করে। বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করা, পুলিশের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া, বিনাখরচায় জল এবং শৌচাগার পাওয়া—এগুলো হচ্ছে তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এগুলি পেলে তাদের একটা নাগরিকত্বের অধিকার তৈরী হবে। এগুলি পেলে নিজেদের দেশে থেকে নিজেদেরকে উদ্বাস্তু বলে মনে হবে না।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ণের ফলে মুম্বাই শহরে বড়লোক ব্যবসায়ী, বড় প্রোমোটার, মিডিয়ার (গণমাধ্যম এবং শিল্পের) প্রচু উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে শহরের উদ্বাস্তু মানুষদের সংখ্যা। এরা বেশীরভাগই অভিবাসীয় শ্রমিক যাদের সরকার সেরকম কাজের সুযোগ দিতে পারে না, আশ্রয় দিতে পারে না এবং দৈনন্দিন সুযোগসুবিধাও দিতে পারে না। নগর সংস্কার বা উন্নয়নের নীতি এবং উদারনীতির ফলে গরিব শ্রমজীবী মানুষের আশ্রয়, বসতি, কাজের সুযোগ, পরিষেবা, কাজের জায়গার অবস্থা, সামাজিক উন্নয়ন এবং অংশগ্রহকারীতা অনেক কমে গিয়েছে। তাই অভিবাসীয় মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের খরচা অনেক বেড়েছে এবং শহুরে জীবনের সুযোগসুবিধাগুলোও অনেক কমেছে। তাদেরকে ''নির্লজ্জ', 'অনৈতিক বাসিন্দা'', 'ভিখারি'', এবং ''জমি জবরদখলকারী'' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের নৈতিক চরিত্রের ভালোমন্দ বিচার করা হয়েছে। গৃহহীন বলে এদের জীবনে ব্যক্তিগত আকাঙ্খ্যা আর গোপনীয়তা বলে কিছুই নেই। এরা দৈনন্দিন জীবনের অনেককিছুই প্রকাশ্যে রাস্তায় করে তাই এদেরকে ''নির্লজ্জ' বলা হয়। তাদের বাড়ি থেকে এবং কাজের জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। আবার তাদেরকেই ''অর্থনৈতিক ও অবৈধভাবে সীমালংঘনকারী'' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। শহরের অন্যান্য মানুষ এবং সরকারের উচিত এদের অবস্থার উন্নতি করা। এদেরকে সম্মানের সাথে দেখা উচিৎ এবং এরা যাতে আশ্রয় পায় এবং দৈনন্দিন জীবনে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ পায় সেটা তাদের দেখা উচিৎ।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp73.pdf

মুম্বাই শহরে অভিবাসীয় মানুষদের উত্থান এবং সমস্যার কারণঃহিংসা এবং ন্যায় বিচারের চিত্র

—সিম্প্রিত সিং

মহারাষ্ট্রে রাজ্য থেকে এবং মুম্বাই থেকে বহু মানুষ মুম্বাই শহরে কাজের সন্ধানে আসে। স্বাধীনতারপূর্বে এবং পরবর্তীকালে অভিবাসন একটি নিয়মিত ঘটনা। মুম্বাই শহরের বৃদ্ধি, আয়তন এবং জনসংখ্যার ওপর অভিবাসনের বিরাট প্রভাব রয়েছে। মুম্বাই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হল অন্য এলাকা বা রাজ্য থেকে অভিবাসন। এখানকার বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষেরাই অভিবাসীয় শ্রমিক। ১৯৬১-এ মোট শ্রমজীবী মানুষের ৮৪ শতাংশই ছিল অভিবাসীয় শ্রমিক। ১৯৪১ ও ১৯৭১-এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ শহরে বসবাসকারী মানুষ মুম্বাইয়ের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছে।

যেসব অভিবাসী মানুষেরা কাজের সন্ধানে মুম্বাই শহরে আসে তাদের মধ্যে নানা বৈচিত্র রয়েছে। তাদের ভাষা, কাজের ধরন, আদি বসতবাড়ি সবই আলাদা। মহারাষ্ট্র থেকে যেসব অভিবাসীয় শ্রমিকরা আসত তারা মূলত বয়ন শিল্প এবং তুলোর কারখানায় কাজ করত। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যারা আসত তারা বাড়ি তৈরির কাজ করত। গুজরাতি, মাড়ওয়ারি ও সিন্ধিরা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত ছিল। ইউপি আর বিহার থেকে যারা আসত তারা ট্যাক্সি আর অটো চালাত আর অন্য লোকের বাড়িতেও কাজ করত। মুম্বাইয়ের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুজরাটের বহু সম্প্রদায়ের মানুষ কাজ করত যেমন পারসি, বানিয়া, ভাতিয়া, বহরা খজা, মেমন এবং ইহুদি।

মুম্বাইয়ের মুসলিমরা কখনওই একছত্র সম্প্রদায় ছিল না। তাদের বিভিন্ন ভাগ যেমন গুজরাটি, মুসলিম, হায়দ্রাবাদি মুসলিম, মহারাষ্ট্রের মুসলিম, ইউপির মুসমিলম এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম। মেমনরা তাদের বাণিজ্যের দক্ষতার জন্য খুব জয়প্রিয় ছিল এবং বহরা ও খোজার মত গুজরাত থেকে আসত। মালাবারি মুসলিমরা আবার বিভিন্ন হোটেলে, চায়ের দোকানে কাজ করত। কঙ্কানী মুসলিমরা চায়নার জিনিস কেনাবেচায় পারদর্শী হয়ে উঠল। ইউপির আন্সারিদের মোমিন বলা হত এবং তারা কাপড় তৈরির কারখানায় কাজ করত এবং বয়ন শিল্পের শ্রমিক হিসেবে দক্ষতা লাভ করেছিল। ইউপির মুসলিমরা শ্রমনির্ভর কাজ যেমন দিনমজুরির কাজে নিযুক্ত ছিল। বেশিরভাগ মুসলিম শ্রমিকেরা চামড়ার কারখানা, জড়ির কাজ, এমব্রয়ডারি, কেকের দোকান, দরজির কাজ, জামাকাপড়ের দোকান, গয়না প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ছিল। দলিতদের মধ্যে মাহাররাই প্রথম মুম্বাই শহরে এসেছিল। এরা মহারাষ্ট্রের মধ্যবর্তী অংশে থাকত। সেখানে প্রচুর খরা হত। তারা নীচু জাতের বলে তাদেরকে নানারকম হিংসা ও ভেদাভেদের সম্মুখীন হতে হত। সেইজন্য তারা মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিল। এরা মূলত চুক্তিমূলক ও দক্ষতাবিহীন কাজ করত। এরা খুব গুছিয়ে সঙ্গবদ্ধ হয়ে কাজ করত তাই অন্যান্য দলিতদের তুলনায় (চাম্বার এবং মাটাং) এরা বেশি নাম করল।

সময়ের সাথে সাথে অভিবাসনের ধরন ও নীতি বদলায়। গত ৫০ বছরে ইউপি ও বিহার থেকে আসা অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। গুজরাত এবং গোয়া থেকে আসা অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যা অনেক কমেছে। রাজ্যের ভিতর থেকে আসা অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যা অনেক কমেছে। গ্রাম থেকে আসা অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। অভিবাসীদের সংজ্ঞাটাই যেন ধীরে ধীরে

বদলে যাচ্ছে। অভিবাসীয় মানুষ যেন ''ভূমিপুত্র'' নয়, যেন ''বহিরাগত'' এবং শহরে যা কিছু খারাপ ঘটে তার জন্য যেন এরাই দায়ী। এরা 'অনৈতিক ভাবে প্রবেশকারী''। এরা ''আতঙ্কবাদী ও শহরের উপর বোঝা''। এই লেখাটিতে বলা হয়েছে কেন এদেরকে মুম্বাইয়ের একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখান হয়েছে। কারা এসবের পেছনে রয়েছে এবং উদপাদমূলক শহর থেকে পরিষেবামূলক শহরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক অর্থনীতি কাজ করে তাও এখানে আলোচিত হয়েছে।

অভিবাসনের বিষয়টি বুঝতে গেলে মুম্বাই শহরের জীবনযাত্রার কথা বুঝতে হবে। এটি একটি বন্দরকেন্দ্রীক শহর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সময়ের সাথে সাথে এটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে এটি আর্থিক ও বাণিজ্যিক শিল্প এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম স্থান। গরিব মানুষের জীবীকার ধরনও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিকাঠামোর পরিবর্তন ও শাসন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলির প্রভাব পড়ল বিভিন্ন জাতিধর্মের মানুষের ওপর এবং সর্বোপরি এই অভিবাসীয় মানুষদের ওপর। মুম্বাই তখন বিশ্বমানের শহর হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল। তাই বিভিন্ন বস্তিবাসী মানুষদের উচ্ছেদ করা হচ্ছিল। তাদেরকে 'অবৈধভাবে প্রবেশকারী'', ''বহিরাগত'' এবং ''অনাবশ্যক'' বলা হচ্ছিল। রাজ্য তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করছিল। মহারাষ্ট্রের বসতি এলাকার আইন ১৯৭১ (পরে সংশোধিত) এর ধারা ৩ (২) (৬) অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের পরে যারা থাকত তাদের দাবীগুলি অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল। এই আইনটি ২০০১ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। এই আইনের ৩ Z- ২ (৬) ধারায় বলা হয়েছিল কোন বে-আইনী বস্তি বা বাড়ি বানাবার ক্ষেত্রে যেসব মালিক/বাসিন্দারা সহায়তা করবে তাদরে ন্যূনতম একবছর ও অধিকতম তিনবছরের জেল হবে। এছাড়া জরিমানা দিতে হবে। এই আইনটি এরকমভাবে ''১৯৯৫'' সালের সময়সীমা বেঁধে দিল। ১৯৯৫ সালের আগে থেকে যারা বাস করত তারাই শুধু উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষিত ছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারত। তাই মুম্বাইয়ের জনসংখ্যা দুই ভাগে বিভক্ত হল। ১৯৯৫ সালের আগে যারা থাকত এবং পরে যারা এসেছিল। ১৯৮৭-এ সময়সীমাটি ছিল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ এবং ১৯৯৫-এ এই সময়সীমাটি বেড়ে হল ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫। ২০১৪ সালে এই সময়সীমাটি বাড়িয়ে করা হল ২০০০।

১৯৯০ থেকে মুম্বাই শহরে বিভিন্ন আইন লাগু হওয়ার ফলে শহরে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা দিল। মিলগুলো বন্ধ হবার ফলে অর্থনীতির ওপর খারাপ প্রভাব পড়ল। ১০০০ একজর জমিতে তৈরি মিলগুলো বন্ধ হয়ে সেখানে অত্যাধুনিক কর্পোরেট পার্ক, শপিং মল, বড় বড় দোকান, পাঁচতারা হোটেল এবং বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি হল। বাড়ি বা আবাসন তৈরির ব্যবসার রমরমা শুরু হল। এর প্রভাব পড়ল বস্তিবাসী অভিবাসীয় মানুষদের ওপর। তাদেরকে উচ্ছেদ করা হল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হল।

মুম্বাই শহর বহু দাঙ্গাহাঙ্গামা, প্রতিবাদ এবং দলিত ও বামপন্থি আন্দোলনের সাক্ষী। অনেক ক্ষেত্রে সরকারও এইসব ঘটনাকে মদত দিয়েছে। শিবসেনা দল যে সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ করেছিল তার প্রভাব পড়েছিল মুসলিম এবং দলিতদের ওপর। তাই মুম্বাইয়ের নগরায়নের বিষয়টি বুঝতে গেলে এইসব হিংসাত্মক ইতিহাসের কথাও জানা দরকার। এই সময় থেকেই অভিবাসীয়ও মানুষদের বোঝা বা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হল।

ব্রিটিশ আমলে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হত কারণ প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝে সরকার অভিবাসীয় মানুষদের দুটি ভাবে বিভক্ত করল, ''যোগ্য'' এবং ''অযোগ্য''। এই অযোগ্য দলটিকে বলা হত ''ভিখারী'', ''বহিরাগত'' বা ''সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক''। স্বাধীনতার পরে এদের অবস্থা আরও কঠিন হল যখন মুম্বাইয়ে দেখা দিল ''ভাষাগত আঞ্চলিকতাবাদ''। বহু সমাজতত্ত্ববিদ ও বামপন্থী মানুষ ''সংযুক্ত মহারষ্ট্র আন্দোলন'' শুরু করল। তবুও মারাঠি এবং মারাঠি নয়—এই দুই প্রকার মানুষের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হল। শিবসেনা আসার পরে ''অভিবাসীয় মানুষ'' এবং ''ভূমিপুত্র''—এই দুইটি রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শিবসেনা বলল যে দক্ষিণভারতের মানুষেরা মুম্বাই শহরে এসে স্থানীয় লোকেদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। এইভাবে রাজনৈতিক ও শিল্পমহলে নানা চাপের সৃষ্টি হল। শিবসেনা আসার পরে নানারকম আন্দোলন শুরু হল। বম্বে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও মহারষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আবির্ভাব ঘটল। প্রথমটি গুজরাটি ব্যবসায়িদের স্বার্থের দিকে নজর দিল। কিন্তু এই ঘটনাটি তৎকালীন বম্বেকে মহারাষ্ট্রের মধ্যেই রাখার ভাবনাটিকে উস্কে দিল। দ্বিতীয় দলটি গ্রামীণ এবং মারাঠিভাষী মানুষদের স্বার্থের দিকে নজর দিল। তখন শিবসেনা প্রধান বাল থেকারে এইসব অভিবাসীয় মানুষদের বলতেন, ''উপরা'' বা ''যাদের আহ্বান করা হয়নি''।

১৯৯৮-এ যখন শিবসেনা সরকার মহারাষ্ট্রে এল তারা এই ''অবৈধভাবে বসবাসকারী'' অভিবাসীয় মানুষদের অন্য জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে লাগল। এরা বেশিরভাগ বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। ১০০০ জন বাঙালি মুসলিমদের বাধ্য করা হয়েছিল কুরলা হাওড়া এক্সপ্রেসে করে চলে যেতে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস দল-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সরব হয় এবং তৎকালীন মুম্বাই সরকারের উদ্যোগটি সফল হয় না। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসা ''অবৈধভাবে বসবাসকারী'' মানুষদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। কিছু ডানপন্থী দল এবং স্থানীয় পুলিশও বলতে থাকে যে এই মানুষেরা অনৈতিকভাবে কাজ করছে তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাই দেখা গেল যে এই অভিবাসন বিরোধী রাজনীতি আসলে হয়ে দাঁড়ল মুসমাল বিরোরী, দলিত বিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী রাজনীতি। শিবসেনার রাজনীতি ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে গেল মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা যার প্রধান ছিল রাজ থেকারে। তিনি ছিলেন উদ্ধভ থেকারের দূর সম্পর্কের ভাই (বাল থেকারের ছেলে)। এই দল বিহারী এবং উত্তর ভারতের অভিবাসীয়ও মানুষদের উচ্ছেদের ভয় দেখাত।

শ্রমিকদের মধ্যে যে সংহতি ও সঙ্গবদ্ধতা ছিল শিবসেনার উদ্দেশ্য ছিল সেটিকে নষ্ট করা। এই সংহতির পেছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণ এবং এই সংহতিটিকে ভাষা এবং জন্মস্থানের নিরীখে ভেঙে ফেলাই ছিল শিবসেনার উদ্দেশ্য। এতে করে আখেরে লাভ হল পুঁজিবাদী মানুষদের। ২০০৪-এ মুম্বাইয়ের পরিচিত (মহারাষ্ট্রের) সাহিত্য জগতের মানুষ, সিনেমা জগতের মানুষ এবং নামীদামী সাংবাদিকরা বম্বে হাই কোর্টে একটি কেস ফাইল করল যাতে তারা আবেদন করল যে এই সমস্ত বস্তিবাসী মানুষদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে যারা অবৈধভাবে বস্তিতে বাস করে তারা পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে বাধা দিচ্ছে। হাইকোর্টকে তারা আবেদন জানাল যে ভোটকেন্দ্রগুলি থেকে এদের নাম তুলে দিতে হবে। যদিও হাইকোর্ট এই আবেদনটি খারিজ করেছিল তবুও শহরের উচ্চত্তি মানুষদের এই গরিব মানুষের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রকাশে উঠে এসেছিল।

অভিবাসীয় মানুষদের তিনভাবে ব্যাখা করা হত—তারা অযোগ্য, তাদেরকে কেউ ডাকেনি এবং তারা বে-আইনী ভাবে বসবাস করে। ব্রিটিশ আমলে শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এদেরকে প্রয়োজন হত। কিন্তু যাদের দক্ষতা কম ছিল তাদেরকে অযোগ্য বলে শহর থেকে বার করার চেষ্টা করা হত। ভারত স্বাধীন হবার কিছু পরে শিবসেনার আমলে এদেরকে বহিরাগত বলা হত এবং মূলত দক্ষিণভারতীয় মুসলিম, দলিত এবং উত্তর ভারতের মানুষেরা এই বৈষম্যের শিকার হত। এই অভিবাসীয় মানুষের ধরন এবং সংজ্ঞা সময়ের সাথে এবং পুঁজিবাদী চাহিদার সাথে সাথে পরিবর্তিত হত। সত্তর-এর দশকে এদের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচার অভিযান শুরু হল। আইনকানুন ব্যবস্থাও এদেরকে অবৈধ, অনৈতিক এবং ক্ষতিকারক হিসেবে চিহ্নিত করল। শহরের উপাদনক্ষেত্রই যখন অধিকতর উস্কাসনের কেন্দ্রবিন্দু হয় তখন এই অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যবৃদ্ধি একটা সমস্যা কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp73.pdf

শ্রমের ভয়ঙ্কর রূপ ঃ অস্থায়ী অর্থনীতিতে মৃত্যু এবং বার্ধক্যের চিত্র

--মৌলেশ্বরি দাস

মুম্বাই শহরটিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু অভিবাসী মানুষের আগমন হয়েছে। মুম্বাইয়ের অর্থনীতির ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে গোড়ার দিকে মুম্বাই শহর বয়নের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। তখন এল পরিষেবামূলক শিল্পের জোয়ার যা আস্তে আস্তে শহরের রূপটাকে বদলে দিল। অভিবাসী বিরোধী আন্দোলন শুরু হল গত কয়েক দশকে যার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। একদিকে অভিবাসী শ্রমিকরা এইসব উৎপাদন, জিনিস তৈরি এবং পরিষেবা শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এরা কাজের সুযোগ পেতে লাগল। কিন্তু এরা বহিরাগত বা অবাঞ্ছিত হিসেবে পরিচয় পেল কারণ এরা শহরের জায়গা, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্থান দখল করেছিল। শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেল। প্রত্যেকে নিজেদের বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। এর ফলে এই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা বা ঐক্যতার ক্ষেত্রে কিছু বাঁধার সৃষ্টি হল।

দারিদ্র্য এবং অস্থায়ী কাজের সমস্যা ছিল। তাই এসব মানুষের দরকার ছিল কাজের ধরনের সাথে পরিচয় হওয়া। শহরের গঠনগত হিংসার সৃষ্টি হল যেগুলো মানুষের হাতের মধ্যে ছিল না। এগুলো কিছু বিশেষ ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে আরও বেশী করে বোঝা যেত এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতাহীনতা আরও বেশী করে প্রকাশ পেত। এই লেখাটিতে অভিবাসীয় মানুষের জীবনের দুটি দিক দেখান হয়েছে দুটো প্রধান জীবীকার নিরীখে। প্রথম বিষয়টি হল এদের মৃত্যুর হার এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হল বৃদ্ধ মানুষদের অস্থায়ী কর্মজীবনের সমস্যা। নোংরা এবং কঠিন বর্জপদার্থ ফেলার ব্যবস্থাপনার কাজে যারা জড়িয়ে আছে তাদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্যুর হার দেখা হয়েছে। বয়স্ক যেসব বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষীরা আছে তাদের বাধ্যক্য এবং অস্থায়ী কাজের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এই দুটি বিষয় শ্রমের বাজারের প্রবল অনিশ্চয়তার দুটি নিদর্শন। এই অস্থায়ী অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে অনিশ্চয়তার দিকটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

এই কাজের জন্য মুম্বাইয়ের বিভিন্ন শ্রমিকদের, তাদের পরিবারের লোকদের এবং শ্রমিক সংগঠনের লোকেদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। (সংরক্ষণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে) মুম্বাইয়ে নোংরা আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ ফেলার কাজে প্রচুর মহিলা ও পুরুষ নিযুক্ত। এই কাজটি কঠিন বলা হয় কারণ মানুষের যখন খুব অল্প দক্ষতা এবং শিক্ষা থাকে তখনই তারা এই ধরনের কাজে নিযুক্ত হয় কারণ তাদের আর অন্য কোনও কাজের আশা থাকে না। এদেরকে সংঘবদ্ধ করা অনেক সময় বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এদের অসহায়তা এবং অনিশ্চিত অবস্থাটি আরও বেশী জটিল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক চাপানউতোরের ফলে স্থায়ী এবং অস্থায়ী কাজের ভাগ হয়। তখন শ্রমিক সংগঠনগুলি গঠন করাও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এরা এদের অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। এই লেখাটিতে তাদের বিপজ্জনক কাজের অবস্থার কথা, তাদের সামাজিক অবস্থান, কাজের অনিশ্চয়তা, ঠিকাদারি নিয়মে কাজের অবস্থা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং সবকিছুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দিক আছে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবেদনে আমরা এই ধরনের কাজের ভয়ঙ্কর রূপের

কথা জানতে পারি। বহু মানুষ তাদের কাজের জায়গার শোচনীয় অবস্থার কারণে মারা যায়। তারা যেসব জিনিস কাজের জায়গায় ব্যবহার করে অনেকসময় তা থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। কাজের জায়গায় তারা নানারকম কঠিন অসুখের শিকার হয়। তাই তাদের জীবন হতাশা ও অপমানে ভরে ওঠে। নোংরা এবং কঠিন বর্জ্যপদার্থ ব্যবস্থাপনার কাজে যারা নিযুক্ত ছিল তাদের কাজের জায়গার সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে মৃত্যু হওয়া, তাদের পরিবারের ক্রমাগত জীবনযাত্রায় টিকে থাকার লড়াই এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও একই রকম পেশায় নিযুক্ত হওয়া—সব মিলিয়ে তারা একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

এই লেখায় যে সমস্ত সংরক্ষণ সম্পর্কিত শ্রমিকদের সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে জানা যায় যে এরা চুক্তিমূলক কাজ করে। কিন্তু এদের থেকে সর্বাধিক শ্রম শুষে নেওয়া হয়। তাদের কাজের ধরন এবং মৃত্যুর সঙ্গে সুক্ষ্ম কিন্তু অনস্বীকার্য সম্পর্ক রয়েছে। অতিরিক্ত মদ্যপান এদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। যারা এসব বর্জ্যপদার্থ ফেলার কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের অত্যন্ত নোংরা পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই অনেক শ্রমিকরাই বলে যে মদ্যপান না করলে ওই ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। এদের কাজের ধরন পাল্টানো না গেলেও পৌরসভার আধিকারিকদের দায়িত্ব ছিল এদের কাজের জায়গা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সরকার পরিচালিত যেসব স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিষেবাগুলি আছে সেগুলির অবস্থা খুবই খারাপ এবং অসম্পূর্ণ এইজন্য তাদের দৈনন্দিন অবস্থা খুবই সংকটজনক। এরপর বাড়ীর কোনও রোজগেরে সদস্য মারা গেলে তাদের জীবন আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে। সামাজিক আয় এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। বহু ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়তে পড়তে ছেড়ে দেয়। তারা বিভিন্ন অস্থায়ী কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা এই বর্জ্যপদার্থ ফেলার পেশাতে নিযুক্ত হয়। যত দিন না এই শ্রমিকদের কাজের জায়গার উন্নতি হচ্ছে ততদিন পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থারও উন্নতি হবে না।

গত কয়েক বছরে মুম্বাই শহরে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে অন্যতম হল নিরাপত্তাকর্মী বা পাহারাদার হিসেবে বয়স্ক মানুষদের নিযুক্ত করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সময় তাদের অবসর গ্রহণ করে একটু আরামে থাকা উচিত, সেই সময় তারা কেন এমন কাজ বেছে নেয় যেখানে তাদের মাইনে অনেক কম, ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয় আর ঘুম এবং সামাজিক নিরপত্তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়? এখানে সরকারের কি ভূমিকা? দারিদ্র্যের সঙ্গে হিংসার কি কোন ভূমিকা বা যোগসূত্র আছে। তার গঠনমূলক বৈশিষ্টই বা কি? এই শ্রমিকরা কি চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতার শিকার?

মুম্বাই মহানগর এলাকার থানে শহরে প্রচুর আইনী রেজিষ্ট্রেশন যুক্ত সংস্থা/কোম্পানী রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের আবাসন/সম্পত্তি রক্ষার্থে এই নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়োগ করে। এই কর্মীরা বিভিন্ন সরকারী কর্মস্থল, বড় বড় আবাসন, বেসরকারি কার্যালয় বা সংস্থা ইত্যাদি পাহারা দেওয়ার কাজ করে। শ্রমের কমিশনার এবং পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব হল এই সমস্ত রেজিস্টার করা কোম্পানীগুলির লাইসেন্স এবং কাজকর্ম দেখাশোনা করা। মুম্বাই সরকার ব্রিহান মুম্বাই এবং থানে জেলার জন্য একটি নিরাপত্তারক্ষী সম্পর্কিত বোর্ড বানিয়েছে যেটি মহারাষ্ট্রের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী আইন ১৯৮১ (চাকরি এবং কল্যাণমূলক)-এর রীতিনীতি অনুযায়ী কাজ করে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের সময় এই নিয়মগুলি মেনে চলে যেমন ন্যূনতম মজুরি কত হবে, (মাসিক আয় ১০৭০৫-১৩০১৫ টাকা নির্ভর করে কোন শ্রেণির নিরাপত্তারক্ষী তার ওপর) চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ন্যূনতম এবং অধিকতম বয়স কত হবে এবং অবসরগ্রহণের সময় বয়স কত হবে। তবে এই সংস্থাগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রচুর বৈচিত্র আছে।

কোনও সংস্থায় ৩০-৩৫ জন কর্মী আছে আবার কোনও সংস্থা দাবি করে তাদের ১৫০০-২০০০ জন কর্মী আছে। মাসিক আয় বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্নরকম। অনেকক্ষেত্রে তা আবার ন্যূনতম মজুরির থেকেও কম।

সরকার এই নিরাপত্তারক্ষী সংক্রান্ত শিল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে সংস্থাগুলি নিয়োগকারী বা ঠিকাদার হিসেবে কাজ করে। বড় বড় বেসরকারি সম্পত্তির মালিকরা এখানে কর্মদাতা বা চাকরি দিচ্ছে। নিরাপত্তা কর্মীরা এই যাজকতন্ত্রের একদম শেষে থেকে। এদের অবস্থাটি খুবই জটিল। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায় যে এই নিরপত্তারক্ষীদের নিজস্ব কোন মতামত নেই। যেই সংস্থা এদের নিয়োগ করে তারাই এদের কাজের জায়গা ঠিক করে। এদের কাজের একটি শর্ত হল যে এদের বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ন্যূনতম বয়সটি মেনে চললেও অনেকসময় এই সংস্থাগুলি অধিকতম বয়সসীমা মেনে চলে না। এর পেছনে একটি যুক্তি রয়েছে। বড় বড় আবাসনে যারা থাকে তারা বেশী মাইনে দিতে নারাজ। তাই তারা বিকল্প হিসেবে বৃদ্ধ শ্রমিকদেরকেই বেছে নেয়— কারণ, তারা অল্প মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া এই বৃদ্ধ গরিব মানুষদের অনেক কম মাইনে দেওয়া হয়। কিছু ঠিকাদার আবার নিজেদের চেনাশোনা লোককে নিয়োগ করে। তাই এই অস্থায়ী কাজে নানারকম শোষণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

কিছু বৃদ্ধ নিরাপত্তারক্ষীদের সাক্ষাতকার নিয়ে জানা যায় যে, এই পরিকাঠামো এবং কাজের নিয়মগুলি তাদের বিরুদ্ধেই কাজ করে। এদের মধ্যে কেউই ঠিকাদার বা নিয়োগকর্তার নাম বলতে চায়নি। এরা সবাই অভিবাসী মানুষ এবং মুম্বাই শহরে এসে তাদের কাজ খুঁজতে কয়েক বছর লেগেছিল। তাদেরকে নানারকম জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়া এবং একজনের আয়ের ওপর সংসার না চলার ফলে বহু অভিবাসী মহিলারাও এই নিরাপত্তারক্ষীর কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। পুরুষরা অন্যান্য কাজ করত বা একাধিক পেশায় জড়িয়ে নিজেদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করত। অনেক বয়স্ক মানুষেরা এই কাজ বেছে নিয়েছিল কারণ অন্যান্য কাজে যে শারীরিক পরিশ্রম লাগে সেটা তারা পারত না। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কখনওই সঠিক মাইনে পেত না এবং দর কষাকষিও বিশেষ করতে পারত না। তাদের রোজগার যে খুবই কম সেটা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখলেই বোঝা যেত। আইনি রীতিনীতিগুলো ভালোভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবুও বয়স্ক লোকেদের এই চুক্তিমূলক কাজে নিযুক্ত হতে হচ্ছিল। এই মুম্বাই শহরে তাদের জীবন সংগ্রাম অনেকদিন ধরেই চলছে। পরিবারকে ভালো রাখার জন্য তারা দিনরাত পরিশ্রম করে এই কাজ করত। তাদের কাজের জায়গায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। তবুও পরিবারের কথা ভেবে ঠিকাদারদের থেকে এই কাজ জোগাড় করেক তারা দিন চালাত। এই গবেষণাটি থেকে বোঝা যায় যে আলোচ্য এই দুই শ্রেণির মানুষের সমস্যা শুধু তাদের কাজের অসুবিধা আর কম মাইনে নয়। তাদের বেঁচে থাকার অবস্থাটাও খুব জটিল। প্রতিনিয়ত তাদের কষ্ট করতে হয়। শরীর অসুস্থ হওয়া এবং মৃত্যু—এদের পরিবারে কোন নতুন ঘটনা নয়। তারা শহরে খুব একঘরে হয়ে পড়ে যা তাদের গ্রামের জীবনে ছিল না। তাদের জীবনে সামাজিক নিরাপত্তা এবং জনকল্যাণমূলক পরিষেবার বড়ই অভাব। তাদের জীবনে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জীবনে রয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। এই নিরপত্তাহিনতা এবং অনিশ্চয়তা দূর করা এবং এই সকল মানুষকে জনকল্যাণমূলক সুযোগসুবিধা দেওয়া—এই দেশের কাছে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

পুরো লেখাটি দেখুন ঃ http //www.mcrg.ac.in/pp74.pdf

অভিবাসন, নিরাপত্তারক্ষী এবং হিংসা মুম্বাইয়ের নিরপত্তারক্ষী কর্মীদের ওপর একটি প্রতিবেদন

ঋতম্ভরা হেব্বর ও মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখাটি মুম্বাইয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর রচিত হয়েছে যারা একদিকে শহরকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে অন্যদিকে আবার তারাই হিংসার রাজনীতির শিকার হয়েছে। এরা অনেক সময় কাজের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে না। এর ফলে নিজের অবস্থা আর অস্তিত্ব দুটোই সঙ্কটের মুখে পড়ে। এরা নিজেরা লোকেদের সুরক্ষার্থে কাজ করলেও অনেক সময় এদেরকেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

মুম্বাইয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া বহু যুগ ধরে চলে এসেছে এবং তা অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ এবং সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। এই মানুষেরা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের। ১৯৬০ থেকে মুম্বাই শহরে এই অভিবাসী মানুষদের প্রতি নানারকম হিংসাত্মক ঘটনার কথা শোনা যায় বিশেষত শিব সেনা আসার পর। শিব সেনার নেতা বাল থেকারে এবং অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষের মনে স্থানীয় বাসিন্দা এবং অভিবাসী মানুষদের মধ্যে পার্থক্যের বীজ বুনে দিল। এতে করে হিংসা এবং ভেদাভেদের সৃষ্টি হল। স্থানীয় লোকেদের বোঝান হল যে তারাই মুম্বাইয়ের প্রকৃত বাসিন্দা এবং ভূমিপুত্র। অভিবাসীয় মানুষেরা হল বহিরাগত এবং অবৈধভাবে বসবাসকারী মানুষ। তখন নানারকম অভিবাসীয় বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠল। শহরের সুরক্ষা এবং নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠল। শহরে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। এর মধ্যে আবির্ভব ঘটল পাহারাদার বা নিরাপত্তারক্ষীর কাজে নিযুক্ত অভিবাসীয় শ্রমিকদের। একদিকে এরাই নানারকম অসহায়তার ও অনিশ্চয়তার শিকার হল। অন্যদিকে এরাই শহরের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কাজে বহাল হল।

এই নিরাপত্তারক্ষীদের সমস্যা যে শুধু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত তা নয়, এদের নিয়ে প্রচুর দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা রয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পনা নিয়ে অনেক আইনি লড়াইও হয়েছে। এদের কাজের অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য অভিবাসীয় শ্রমিকদের বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখলে হবে না। এই বিষয়ের জটিলতাগুলোও বুঝতে হবে। তার জন্য সুরক্ষার কাজ সংক্রান্ত শহরের সামাজিক দিকগুলি আরও ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। এর সঙ্গে নিরাপত্তা, অভিবাসন এবং শ্রমের কি সম্পর্ক আছে তাও দেখতে হবে।

এই গবেষণাটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু শিল্পের ওপর করা হয়েছে। গবেষকরা মুম্বাইয়ের এই সুরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেছেন এবং এর আইনি পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অভিবাসীয় মানুষদের ইতিহাস, সময়ের সাথে এদের কাজের পরিবর্তন এবং কেন তাদেরকে একঘরে করে রাখা হয়—এই সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে স্থান এবং কাঠামোগত হিংসা এদের দৈনন্দিন জীবন ও কাজের জায়গায় কি প্রভাব ফেলে তাও দেখা হয়েছে।

গবেষকরা বিভিন্ন নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থাগুলিতে গিয়ে দেখা করেছেন। এইভাবে সেই সমস্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির কাজকর্মের ধরন বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা নিরাপত্তারক্ষী কর্মীদের কাজের জায়গায় গিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এই শ্রমিকদের সাথে তাঁরা মেলামেশা করেছেন, ডিউটি বা কাজে থাকাকালীন এদেরকে লক্ষ্য করেছেন, সংস্থার মালিক এবং ম্যানেজারদের সাথে কথা বলেছেন। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারগুলি কিছুটা সৌজন্যমূলক ছিল এবং প্রশ্নগুলো একটু নিয়মমাফিক করা হয়েছিল। কিছুটা আবার

পরিস্থিতি বুঝে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সময় কম ছিল বলে শুধু পুরুষ নিরাপত্তারক্ষীদেরই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। এটি একটি সরকারি সংস্থা যেটা নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়োগ করে। এটি নিরাপত্তারক্ষীদের কাজের সুরক্ষার্থে এবং শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় তৈরি করে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল।

গবেষকদের কাছে অভিবাসনের বিষয়টি খুবই পরিবর্তনশীল। অভিবাসীয় মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে যদি শহরের সামাজিক দিকগুলি দেখতে হয় তাহলে একটি স্থানের ওপর শুধু নির্ভর করলে চলবে না। তাই বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন লোকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। যেমন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করার সংস্থা, বড় বড় আবাসন, বিভিন্ন কার্যালয়, অন্যান্য কাজের জায়গা যেমন এ.টি.এম ছত্রবত্তা ধর্মশালা, গার্ড বোর্ডের কার্যালয়, শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় প্রভৃতিতে গিয়ে লোকেদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মরত অবস্থায় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা অবলম্বন করে সাক্ষাৎকারগুলি নেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়োগ করার শিল্প দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠেছে। সারা দেশে ৬ মিলিয়ন (এক মিলিয়ন = ১০ লাভ) -এরও বেশি লোক এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। এই মানবনির্ভর পাহারা দেওয়ার পরিষেবাগুলি দিনে দিনে বেড়ে উঠছে কারণ, পরিকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে। নানারকম শিল্পের বৃদ্ধি হচ্ছে। এছাড়া হরতাল, আতঙ্কবাদ এবং রাজনৈতিক কোলাহলের ফলে নিরাপত্তাজনিত নানারকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যার ফলে এই নিরাপত্তারক্ষীদের প্রয়োজন বাড়ছে। তাই এই বেসরকারি নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিষেবার মূল গ্রাহক হল শিল্পপতি এবং বড় সংস্থার লোকেরা।

মানুষকে দিয়ে পাহারা দেওয়ার শিল্পটি একদমই সংগঠিত নয়। সংগঠিত বাজারে এই শিল্পের পরিমান ৩৫ শতাংশ। শহরে বড় বড় কোম্পানি আছে যারা এই কাজের ক্ষেত্রে বড় সংগঠন, কর্পোরেট এবং অন্যান্য সংস্থাকে যোগাযোগ করে। ব্যক্তিগত বাড়ি বা আবাসন আছে যাদের তারা এই সমস্ত অসংগঠিত, ব্যক্তিনির্ভর নিরাপত্তারক্ষীদেরকেই কাজে বহাল করে এবং তার জন্য মাঝারি ও ছোট সংস্থাগুলিকে যোগাযোগ করে। এই ছোট সংস্থাগুলির কাজকর্মের নিয়মনীতি খুব বেশি স্বচ্ছ নয়। তারা কিভাবে কাজ করে এবং কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করে কি না এসবই দেখার বিষয়। সরকারের নজর থাকে বড় বড় কোম্পানিগুলির উপর যারা নিরাপত্তাশিল্পের সাথে জড়িত কারণ এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি বড় দিক। অসংগঠিত পাহারাদারদের ওপর এবং তাদের নিয়োগকারী ছোটখাটো সংস্থাগুলোর ওপর সরকারের বেশি নজর থাকে না।

ছোটখাটো সংস্থাগুলি প্রতি পাহারাদর হিসেবে রোজগার করে। তাদের মুনাফা নির্ভর করে পাহারাদারদের সংখ্যার ওপর। সেজন্য অনেক সংস্থা বেশি পাহারাদার নেওয়ার পরিকল্পনা করে কিন্তু বাস্তবে অনেক কম পাহারাদার নিয়োগ করে। এতে করে পাহারাদারদের কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় পাহারাদারদের অনেক বাড়তি কাজ করতে হয় যেমন, ঘরদোর পরিষ্কার করা, দুই বেলা কাজ করা ইত্যাদি। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তাঁরা অনেকেই দু'বেলা (Two Shift) কাজ করে। তারা দিনে ১২ ঘণ্টা করে একবেলার কাজ করে। কাজগুলি তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে করে। এক বেলা কাজ করলে তাদের মাস মাইনে ৫০০০ টাকা। তাই দুবেলা মানে ২৪ ঘণ্টা কাজ করলে তাদের সংসারের কিছু আর্থিক সুরাহা হয়। দুইবেলা কাজ করলে তাদের থাকা খাওয়ারও কিছুটা সুবিধে হয়। অনেকের কাছেই

রাত্রে পাহারা দেওয়ার কাজ বেশ লাভজনক কারণ, মুম্বাই শহরে তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে যায় যা এমনিতে খুবই খরচসাপেক্ষ।

এই শিল্পটি ছিল আবরণে ঢাকা। গোপনে কাজকর্ম চলত এবং কিছু সময় রাজনৈতিক যোগসাজশও ছিল। তাই কতজন পাহারাদার নিযুক্ত হল সেটা সবসময় পরিস্কার ছিল না। কিছু সংস্থাকে সাক্ষাৎ করে বোঝা গেল যে বেশিরাভাগ মালিকেরই রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। এরা মূলতঃ উত্তরভারতের বাসিন্দা। এদের সাথে বড় বড় সরকারি আধিকারিকদের যোগাযোগ আছে। রাজনীতিবিদ ছাড়া বড় বড় সেনাবাহিনীর আধিকারিকরাও এই শিল্পের একদম প্রথম সারিতে থাকে। এরা সরকারের কাছ থেকে এইসব সংস্থা চালানোর আইনি অনুমোদন পায়। এই ব্যবসায় নানারকম আমলাতান্ত্রিক (গড়িমসি ও দুর্নীতির) ঘটনার কথাও শোনা যায়। সংস্থার মালিকেরা সরকারের সাথে কথা বলে এই ব্যবসা শুরু করার নথিপত্র জোগাড় করত। অভিবাসীয় মানুষদের এই কাজে ঢোকার ক্ষেত্রে সাহায্য করত তাদের বন্ধু, আত্মীয় এবং একটি গোটা পরিবেশ না নেটওয়ার্ক। এইসব মানুষদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের ওপর কাজের জন্য নির্ভর করতে হত। এছাড়া এরা জাতপাত, সম্প্রদায় সংক্রান্ত বৈষম্যেরও শিকার হত। এই জাতপাতের বিষয়টি একদিকে যেমন তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বোঝাত অন্যদিকে তাদেরকে এই শহরের মানুষদের থেকে আলাদা করে রাখত। এইভাবে গ্রামীণ পরিচয় থেকে তারা যেন ঠিক বেরিয়ে আসতে পারছিল না। তারা সংস্থাগুলির ওপর নির্ভর করত। এদের অনুমতি ছাড়া এরা কাজ পেত না। কাজের অবস্থা, চুক্তির নিয়ম—সব এই সংস্থাগুলি ঠিক করত। বিভিন্ন দালালদের রমরমা ছিল এই পেশায়। গরিব অভিবাসীয় শ্রমিকেরা এদের দ্বারা শোষিত হত। আইনকানুনের জটিলতা অনেক সময় এদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে পারত না।

যেসব নিরাপত্তারক্ষীরে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা ইউপি, বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্র থেকে এসেছে। দারিদ্র্যই তাদেরকে শিকড়ের টান ছেড়ে অন্য জায়গায় আসতে বাধ্য করে। তারা শহরে এসে কাজের সুযোগ খোঁজে। কিন্তু শহুরে রাজনীতি দুই ভাগে বিভক্ত— মারাঠি এবং মারাঠি নয় এই দুই ভাগের সূচনা হয় এবং এদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়। একদিকে ''মারাঠি মানুষ'' অন্যদিকে বিহার ও ইউপি-র ''ভাইয়া''। এই বিভেদ থেকে শোষণের জন্ম হয়। অনেক পরিচয়ই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। যেমন বাড়ির মালিক এবং বাড়ির মালিক নয়, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে ইত্যাদি। ঘরের লোক এবং বহিরাগত এই দুই বিভাজনের সৃষ্টি হয় যা অভিবাসীয় মানুষদের জীবনে নানা সমস্যা ডেকে আনে। নিরাপত্তারক্ষীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের জীবনে সম্পর্কে, কাজের জায়গার শোষণ সম্পর্কে, বিভিন্ন সংগ্রাম সম্পর্কে ও পাহারাদারদের কাজ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। সাক্ষাৎকারগুলি থেকে আমরা যে যে বিষয় জানতে পারি তা হল ঃ—

১। চাষবাসের ক্ষয়ক্ষতি, ভূমিসংক্রান্ত সম্পর্কের জটিলতা, পরিবারের অসচ্ছলতা এবং ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে—মূলত এই কারণেই গ্রামের মানুষেরা শহরে এসে কাজ খোঁজে। বিশেষ করে উঁচু জাতের অভিবাসীয় মানুষেরা উপরোক্ত কারণেই শহরে এসে পরিষ্কার ও সুষ্ঠ কাজের সন্ধান করে।

২। চাষবাসের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিশ্রম লাগে। শহুরে জীবনের কাজ এত পরিশ্রমের নয়। তাদের একটা ভয় কাজ করে যে শহরে কাজ করতে গিয়ে তাদের পরিশ্রম ক্ষমতা বা অভ্যেস যেন কমে না যায়। এই ভয় আবার অনেককে মানবনির্ভর শ্রমের প্রতি বিমুখ করে তোলে। এই বিমুখতার আর একটা কারণ হতে পারে জাতপাত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নারী পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ— এক কথায়

বলতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট কাজ যেন কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকেই করতে পারে।

৩। অভিবাসীয় মানুষেরা তাদের আদি বাড়ি ও গ্রামের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। কাজে ছুটিছাটা পেলেই তারা গ্রাম থেকে ঘুরে আসে। ভবিষ্যতে নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবার পরিকল্পনা অনেকেরই থাকে। অনেকেই তাদের পরিবারকে গ্রামে রেখে আসে এবং সুযোগমত তাদের সাথে দেখা করে।

৪। পাহারদারদের মত তাদের কাজে অনেক ঝুঁকি আছে। নানারকম অসৎ উপায়ে এই ব্যবসা বা শিল্প চলে। তাদের কাজের অবস্থাও খুবই নিম্নমানের। তাদের উপার্জন ক্ষমতা খুবই কম এবং অনিয়মিত রোজগার। তাদের সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় যে এই বুঝি তাদের চাকরি চলে যাবে। তাদের কাজটি সংগঠিত নয় এবং নিজেদের মধ্যে তারা খুব বেশি সঙ্গবদ্ধ নয়। তারা ভয় পায় যে কোন অপরাধমূলক কাজে তাদেরকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাই তারা বেশি প্রতিবাদ করে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার তাদের ভাল অভিজ্ঞতাও হয়। পিতৃতুল্য আচরণ এবং উদার মানসিকতা দেখে অনেক সময় তারা আপ্লুত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে এসবের জন্যই তারা লোকেদের সন্দেহের মুখে পড়ে।

৫। সাক্ষাৎকারগুলো থেকে বোঝা যায় যে এদের কাজের মধ্যে দিয়ে নানা ব্যর্থতা বা হাতাশা প্রকাশ পায়। অনেকে বলে কাজটি খুব একঘেঁয়ে। অনেকে বলে এটা বেকারদের কাজ। এদের মধ্যে বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শনের এ কটা চেষ্টা এবং জীবন সম্পর্কে গভীর দুঃখ রয়েছে। তাই এদের মনোবল অনেকটাই ভেঙে পড়ে।

৬। তাদের একটা কথাই মনে হয় যে এই কাজটা খুবই সম্মানজনক কাজ। লোকেদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে ঘরসংসারের কাজ করার ক্ষেত্রে এই কাজ অনেক বেশি সম্মানের।

৭। সংস্থা থেকে একজন দালালকে ঠিক করা হয় যে কাজের জায়গাগুলি পরিদর্শন করে দেখে যে পাহারাদারেরা ঠিকমতন কাজ করছে কিনা। এরা সংস্থা এবং পাহারাদারদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু পাহারাদারের সাথে এদের সম্পর্ক দৃঢ় হয় না। এছাড়া পাহারাদারদের সাথে সংস্থার সম্পর্কও খুব গভীর হয় না। তাই কাজের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

৮। সাক্ষাৎকার থেকে এটা বোঝা যায় যে অভিবাসীয় মানুষেরা সবসময়ই বাইরের লোক (পারপ্রান্তি) বলে গণ্য হয়। তারা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে শহর গড়ে তোলে। তাঁরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শহরে সম্পত্তি কেনে, রেশন কার্ড বানায়, আধার কার্ড বানায় এবং সরকারি চাকরি খোঁজে। পরিবারকে নিয়ে এসে তারা বসতি স্থাপন করে এবং অনেকে এখানে এসে বিয়েও করে। তবুও তাদেরকে শহরের লোক বলে গণ্য করা হয় না। বাইরের লোকই ভাবা হয়।

৯। অভিবাসীয় নিরপত্তারক্ষীদের নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে ''রক্ষক-ই-ভক্ষক''। একটা ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য যেখানে এক কম বয়সী মহিলাকে এক নিরাপত্তারক্ষীকর্মী যৌন হেনস্থা করে খুন করে। মহিলাটি মুম্বাইয়ের এক আবাসনে থাকত যেখানে এই নিরাপত্তারক্ষী কর্মীটি কাজ করত। তাই কিছু ক্ষেত্রে এই মানুষেরা অপরাধী আবার বহু ক্ষেত্রে এরা সজাগ পাহারাদার এবং অপরাধদমনকারী। একদিকে যেমন এরা পুলিশের বিকল্প, অন্যদিকে অভিবাসীয় শ্রমিক হওয়ার জন্য এরা বিভিন্নরকম শোষণ ও হিংসার শিকার। এদের কাজের জায়গা বা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও সংকটপূর্ণ। এরা খুবই অসহায়, একাকী এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলা

মানুষ। কাজের নিয়মনীতি অনেকসময় ঠিকমত মানা হয় না এবং তারা শোষণের শিকার হয়। এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তবেই বোঝা যাবে শহরের বুকে এদের অবস্থানটি ঠিক কোথায়। এর আগে যে মহিলা খুনের ঘটনাটি আলোচনা করা হল সেটা এই পাহারদারদের হিংসা প্রদর্শনের এক চিত্র। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এদের স্থান এবং গঠনমূলক যে হিংসার শিকার হতে হয় তা অনেকেই মনে রাখে না। হিংসা, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু তাদেরকে যখন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখন বারবারই বলা হয় যে তারা অভিবাসীয় শ্রমিক। এদেরকে একঘরে করে দেওয়া হয় এবং এদেরকে বাঁধাধরা একটি আখ্যান দেওয়া হয় যে এরা বাইরের লোক। তাই এদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটা যেন খুবই সাধারণ ব্যাপার।

১০। অভিবাসীয় মানুষদের নানরকম অভিজ্ঞতা। এরা নিজেরা বিভিন্ন ধরনের মানুষ। এরা সকলেই কিন্তু আশাবাদী যে মুম্বাই শহরের মধ্যে ক্ষমতা আছে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করার। মুম্বাইয়ে নানারকম আন্দোলন হয়েছে। অভিবাসীয় মানুষদের মধ্যে ধনি ও গরিবের বিভাজন রয়েছে। একদল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অন্য দলের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী। কিন্তু মুম্বাই সকলের কাছেই একটি আশাপূর্ণ ও ভরসাপূর্ণ শহর।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp74.pdf

সংক্ষিপ্ত গবেষণা
বিভাগ ৪ : শিলিগুড়ি এবং বিহারের কোশি এলাকা

উত্তরবঙ্গের সংযোগস্থল ঃ বিশ্বায়নের পটভূমিকায় শিলিগুড়ি

সমীর কুমার দাস

এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত শিলিগুড়ি শহর নিয়ে লেখা। এই শহরটি অভিবাসীয় মানুষদের কাছে একটি সংযোগস্থল। এখানে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যান্য রাজ্য এবং দেশ থেকে বিভিন্ন মানুষেরা কাজের সন্ধানে আসে। তাই এটিকে অভিবাসীয় মানুষদের শহরও বলা হয়। তবে গত কয়েক বছরে অভিবাসনের ধরন বদলেছে।

বিশের দশকে শিলিগুড়ি অঞ্চল একটি বড় গ্রাম ছিল যেখানে কয়েক হাজার মানুষ বাস করত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিভিন্ন রাজ্য এবং প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে অভিবাসীয় মানুষেরা আসতে লাগল। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। শিলিগুড়ি একটি বড় শহর হয়ে উঠল এবং কলকাতার পরেই এটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। গত কয়েক বছরে এই শহরে জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২০০১-এ আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১,২২০,২৭৫ আর ২০০৪-এ তা হল ১,৫৫৯,২৭৫। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হল ভারতের মধ্যে ও অন্যান্য দেশ থেকে অভিবাসন। এই মানুষদের সামাজিক পটভূমি বা জাতপাতের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ এদের জন্মস্থান ও কর্মস্থানের উপর নির্ভর করে তাদের জাত, সম্প্রদায় বা সামাজিক পটভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। ১৯৮১—১৯৯১-এ শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই জমির উপর যথেষ্ট চাপ পড়েছিল কারণ, জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বস্তির সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছিল। ১৯৭৫-এ ৩৬টি বস্তি ছিল যা ২০০৩—২০০৪-এ বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৬। ১৯৯১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী শিলিগুড়ির ২১.৫৭ শতাংশ লোকেরা বস্তিতে বাস করে যার মধ্যে বেশিরভাগই অভিবাসীয় মানুষ।

অভিবাসীয় মানুষেরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। ১৯৪৭-এর পরে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল তারা শহরের মধ্যিখানে বাস করত। বাকি যারা শহরের দরিদ্র মানুষ তারা রেলওয়ে লাইনের ধারে এবং সুকনা নদীর ধারে ছোট ছোট কলোনিতে বাস করত। সবচেয়ে বেশি অভিবাসীয় মানুষ আসে বাংলাদেশ থেকে। এছাড়া অন্যান্য গরিব রাজ্য যেমন বিহার, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশা থেকে প্রচুর লোক এসেছিল। শিলিগুড়ি তাই এখন অভিবাসীয় মানুষের শহর হিসেবে পরিচিত। এখানে বিভিন্ন জাতের ও সম্প্রদায়ের বাস। তাই এখানে ২০টিরও বেশি ভাষায় পত্রপত্রিকা ও খবরের কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

শিলিগুড়িতে শিল্পের খুব বেশি প্রসার ছিল না। শিলিগুড়ির নগরায়ণ অন্যান্য শহরের মত নয়। অন্যান্য জায়গার শিল্পায়নের সাথে শিলিগুড়ির তুলনা চলে না। শিল্পায়নের অগ্রগতি না হওয়ার ফলে শিলিগুড়ি একটি বাজার কেন্দ্রিক বা ছোটখাটো ব্যবসাবাণিজ্যের শহর হিসেবে পরিচিত ছিল। পাইকারি বাজারের জন্য শিলিগুড়ি ১৯৬১ থেকে খুবই বিখ্যাত। প্রত্যেক ১০০ জন প্রতি তিনটে করে খুচরো ব্যবসা আছে, দিল্লীতে যার সংখ্যা ০.২১। এই সংখ্যাটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ১৯৮১-র পরে রাজ্য সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতর যেমন সীমান্তরেখার নিরাপত্তা বাহিনী, স্বহস্ত সীমা বাল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রভৃতি শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সাম্প্রতিকালে ২০১৩-তে পুলিশ কমিশনারেট এবং সরকারের দফতর ফুলবাড়ির উত্তরকন্যায় স্থাপিত হয়। ১৯৬২-এ চায়নার সঙ্গে যুদ্ধ,

১৯৬৫-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, সবশেষে ১৯৭১-এ পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বাংলাদেশ তৈরি হওয়া—এ সবকটি ঘটনারই উদ্বাস্ত তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে খুব বড় ভূমিকা ছিল।

শহর যত বাড়তে থাকে, বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা। তার ফলে চারপাশের চা বাগানের ওপর চাপ পড়তে থাকে। প্রচুর চা শ্রমিকরা উচ্ছেদিত হয়। তারাক আরও গরিব হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনিকভাবে এই জাগয়াগুলি শিলিগুড়ি শহরের অংশ হিসেবে গঠিত হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় ''যোগ করা অংশ''। এই যোগ করা অংশগুলি হল দাবগ্রাম, ভক্তিনগর, ফুলবাড়ি, মাটিগরা, বাগডোগরা এবং সুকনা। শহরের মাঝখান দিয়ে তিনটি নদী বয়ে চলে—বালাসন, মহানন্দ এবং তিস্তা। তাই ভৌগলিক বৃদ্ধি করার খুব একটা সুযোগ থাকে না।

১৯৮০-র শেষের দিকে ডুয়ার্স ও তেরাই অঞ্চলের চা শিল্পে যে সঙ্কট দেখা গিয়েছিল তার মূল কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ডুয়ার্স-এর ৭২টি চা বাগান এখন রুগ্ন শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার ৬টি চা বাগান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অনেকগুলি টিকে থাকার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ৩০০০ জন স্থানী কর্মী তাদের চাকরি হারিয়েছে। যে সব চা বাগান খোলা আছে সেখানকার শ্রমিকদের দৈনন্দিন মজুরি ৯৫ টাকা যা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে খুবই অল্প মজুরি। রেডব্যাঙ্ক গ্রুপ ৩টি চা বাগানের মালিক। এছাড়া সুরেন্দ্রানগর চা এস্টেট এবং ধরণিপুর চা এস্টেট ছিল যা সাম্প্রতিককালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে করে ২,২০০ মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ল। আলিপুরদুয়ারে দুটো চা বাগান ছিল, ঢেকলাপাড়া চা বাগান ও বান্দাপানি চা বাগান যেগুলো বহু বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। এই পাঁচটা চা বাগানে ১৫০০০ শ্রমিক এবং ৪৫০০০ নির্ভরশীল মানুষ বাস করত। এদের সকলের জীবনজীবিকা এই চা বাগানের ওপর নির্ভর করত। শিল্পের সংকটপূর্ণ অবস্থার ফলে আশেপাশের জায়গাগুলো এবং গ্রামগুলো জমির দালাল, প্রমোটার, ডেভেলপার ও জমির মাফিয়াতে ছেয়ে গেল। চা বাগানগুলো যখন আর টিকে থাকার অবস্থায় রইল না তখন চা বাগানের এলাকাগুলোতেই আবাসন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল কারণ তা অনেকে বেশি লাভজনক ছিল। তার একটা বড় নিদর্শন হল চাঁদমনি চা বাগান যেটি বন্ধ হওয়াতে প্রচুর চা বাগানের শ্রমিক উচ্ছেদিত হয়েছিল। চা বাগান বন্ধ হবার আগে থেকেই অনেকে অস্থায়ী শ্রমিক হয়ে গিয়েছিল। তারা বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নিল। বস্তিগুলি খাস জমিতে রাস্তার অন্য ধারে অবস্থিত ছিল। শিলিগুড়িতে দুই ধরনের অভিবাসীয় মানুষ ছিল। একদল বিভিন্ন খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। এবং প্রচুর টাকা অর্জন করে নিজের বাড়ি যেত। এদের বাড়ি বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের বাইরে অবস্থিত ছিল। আর একদল ছিল বাস্তুহারা যারা শহরের নানারূপ পরিবর্তনের ফলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। চা বাগান বন্ধ হলে শ্রমিকরা কি করত? এর উত্তরে বলা যায় যে, অনেকে ভুটান এবং অন্যান্য জায়গায় কাজের সন্ধানে যেত। তারা শুকনো নদীগর্ভ থেকে পাথর সন্ধানের কাজ করত। এছাড়া চুনাপাথর পিষ্ট করা ও ডলোমাইটের খনিতে কাজ করত। যে সকল চা বাগান তখনও ভালো অবস্থায় ছিল বাকিরা সেগুলোতে কাজ খুঁজত। বেশিরভাগ চা শ্রমিকের দক্ষতা ছিল না এবং তাদের যাতায়াতও খুব কম ছিল। তাই তারা বালাসন এবং অন্যান্য নদীর গর্ভ থেকে পাথর কুড়োত এবং ঠিকাদারদের কাছে সেগুলি বিক্রি করত। তাদের হাতে ঘা হয়ে যেত এবং তারা নানারকম অসুখে ভুগত। চাবাগান থেকে খুব ঘন ঘন নারীপাচার হতও। যারা চা বাগানে পড়ে থাকত (পাচার বা বিক্রি না হয়ে) তারা অনাহারে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ত।

এই প্রসঙ্গে শহরের গরিব মানুষদের জীবিকার ধরন জানাটা খুব জরুরি। নতুন করে যে অভিবাসীয় মানুষেরা আসে তারা বড় বড় আবাসনে কাজ নেয় কারণ অস্থায়ী কাজের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। লোকের বাড়ীর কাজ, সেবামূলক কাজ, আয়া, নোংরা আবর্জনা ফেলা, ইলেকট্রিকের কাজ, আবর্জনা ফেলা, কলের মিস্ত্রী, জামাকাপড় কাচা, অল্পদক্ষতা সম্পন্ন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এবং অন্যান্য পরিষেবামূলক কাজে এরা যুক্ত থাকে। এছাড়া অবৈধ চোরাকারবার, নদীগর্ভ থেকে চুনাপাথর সংগ্রহ করার কাজেও এরা নিযুক্ত থাকত। এই ক্ষেত্রটি দাললদের অধীনে ছিল। এরা কাজের এজেন্ট আর কর্মদাতা ছিল। এই অস্থায়ী শ্রমিকদের মাইনে খুবই কম ছিল। এরা তাদের মজুরি নিয়ে বেশি দরদামও করতে পারত না কারণ এরা খুবই গবির ছিল। এদের দক্ষতার অভাব ছিল এবং এই কাজগুলির কোন স্থায়িত্ব ছিল না। শিলিগুড়ি বাজারে যারা মাল বওয়ার কাজ করত তারা পাইকারে ব্যবসায়ীদের দ্বারা শোষিত হত। এই ব্যবসায়ীরা দরিদ্র শ্রমিকদের অস্থায়ী অবস্থার আর দারিদ্রের সুযোগ নিত। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণির লোকেরা যেমন কোনও সংস্থার মালিক, পাইকারি ব্যবসায়ী, সেনা, সরকারি অফিসার, এন.জি.ও— এরা বর্ডারের বাইরে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল (কিছু ক্ষেত্রে বেআইনি)। কিন্তু তারা বড় বড় বিলাসবহুল আবাসনে অত্যন্ত আরামদায়ক অবস্থায় বাস করত (এগুলো বেশিরভাগ সরকার বা শিলিগুড়ি পুরসভা থেকে দেওয়া হত। বেনেডিক্ট এন্ডরসন-এর ভাষায় এগুলো ''পবিত্র স্থান'' তাই বাইরের জগতের সাধারণ মানুষেরা এগুলো থেকে বেশ দূরত্বেই বাস করত।

শিলিগুড়ি শহর হল উত্তরবঙ্গের এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্য ও দেশের মধ্যে সংযোগস্থল। এখানে প্রধানত দুই ধরনের হিংসার ঘটনা দেখা যায়। একটি হল অপরাধমূলক হিংসা যেটি বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার অপরাধমূলক কাজকর্ম ও যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়টি হল এখানকার অনেক মানুষই গৃহহীন। শিলিগুড়ি একটি সংযোগস্থল বলে কারোরই শহয় নয়। গৃহহীন হয়ে থাকার জন্য মানুষের মনে নানা ভয় কাজ করে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও টাকার প্রবাহ বেড়ে চলার জন্য শিলিগুড়ি শহরে বাড়ি করার চাহিদাও বাড়তে থাকে। এর থেকে হিংসা জন্ম নিল। বলা যেতে পারে শিলিগুড়িকে অনেকে স্বদেশ বলে দাবী করত কিন্তু বাস্তবে সেটা কারো নিজের বাড়ি হয়ে উঠতে পারছিল না। শিলিগুড়িতে কোন জাতিগত হিংসার ইতিহাস ছিল না। কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশে পুরোপুরি শান্তি ছিল না। সামাজিক পরিবেশে কিছুটা ফাটল ধরেছিল। গোর্খা জনমুক্তি মোরচা (জি.টি.এম.) দাবী করেছিল শিলিগুড়ির মৌজাকে গোর্খা এলাকার প্রশাসনে নয়ে আসতে হবে (গোরখা টেরিটোরিয়াল এডমিনিসট্রেসন, জি.টি.এ.)। অন্যদিকে বাঙালিদের স্বপক্ষে যেসব সংগঠনগুলি ছিল তারা এই জি.টি.এর মধ্যে মৌজাগুলিকে আনার পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিল। চরম ডানপন্থী সংগঠন ''আমরা বাঙালি''ও একই সুরে উত্তরবঙ্গে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিবাসন তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল কারণ, এটির সঙ্গে সামাজিক বিচারের দিকটিও জড়িয়ে আছে। এই বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ যারা শিলিগুড়ি থেকে উচ্ছেদিত হয়ে গৃহহারা হয়ে পড়েছিল তারাই কিন্তু তাদের জীবনজীবিকার জন্য এই শহরের ওপর নির্ভর করত। এছাড়া তারাই ধনি মানুষদের জন্য ''বাড়ি'' বানিয়েছিল। সেই ধনি মানুষেরা সেইসব বাড়িতে থাকত না বললেই চলে। তাদের অন্য জায়গাতেও বিলাসবহুল বাড়ি ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে যে যারা সবসময় শহরে উপস্থিত থাকে না তাদের জন্য শিলিগুড়িতে জায়গা আছে। কিন্তু গৃহহীন মানুষদের জন্য জায়গা নেই।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিবাসন সংক্রান্ত ন্যায় বিচারের যে দিকটিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় তা হল সম্পদের অসব বন্টন এবং অভিবাসীয় মানুষদের সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চি হওয়া। তবে বিষয়টি একদমই চোখে দেখা যায় না। রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে এটা অন্তর্নিহিত থাকে। এই ধরনের অভিবাসীয় মানুষদের কথা তাদের নিজেদেরে দেশে বা জায়গায় প্রকাশিত হয় না। এই নামহীনতা বা অপ্রকাশিত থাকার জন্য তাদের কথাগুলি সাধারণত মানুষের চোখের আড়ালে থেকে যায়।

গরীব এবং অবহেলিত মানুষেরা শহরে থাকে কিন্তু তারা নাগরিক নয়। কারণ তাদের শহরের প্রতি কোন অধিকার নেই। তারা প্রায়শই হিংসার শিকার হয়। যেমন তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ধর্ষণ করা হয়, বল প্রয়োগ করে টাকা পয়সা নেওয়া হয়, পুলিশের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, মারধর খেতে হয়, খুন হয় এবং অনেক সময় বিতাড়িত হতে হয়। তারা নিজেদের আইনত ভাবে শহরের নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না তাই তারা অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শিলিগুড়ি শহরে (বা বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে) সেরকম ভাবে সামাজিক আন্দোলন এখনো গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে মহিলা যৌনকর্মী, প্রতিনিয়ত চলা ফেরা করে এমন মহিলারা, কুলি, মাল বহনকারী এবং দিনমজুরের ক্ষেত্রে—সামাজিক ন্যায় বিচারগুলির সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। অবহেলিত মানুষ, প্ল্যাটফর্মে বসবাসকারী শিশু, চা বাগানের শ্রমিক (যারা কাজ হারিয়ে শহরে আসে) পাচার হওয়া শিশু এবং মহিলা এরাও সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। তাই বলা যেতে পারে যেসব মহিলা ও শিশুদের অভিবাসন করতে বাধ্য করা হয় তাদের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই করতে হয়। বিভিন্ন এনজিও তাদের ন্যায় বিচার পেতে সাহায্য করে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজকে আরো এগিয়ে আসতে হবে।

এখানকার মানুষেরা অবস্থানগত বিভিন্ন জায়গায় থাকে। তাই এদের চাহিদাগুলো পূরণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিরা এদের সমস্যাগুলো বুঝতেই পারে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠিগুলিও নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাই সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সেটাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বায়ণের ফলস্বরূপ এই আঞ্চলিকতার সৃষ্টি হয়। যারা নানারকম শোষণের শিকার হয় তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকার ফলে সংগঠিত হতে পারে না। তাই ন্যায় বিচারও হয় না। তারা নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করে। একটি জায়গায় স্থির থাকে না। তাই তাদের সমস্যাগুলো মানুষের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যায়। অনেক সময় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটে বা লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু তার মূল গভীরে না গিয়ে খুব সাময়িক প্রতিক্রিয়া হয়। উপরোক্ত কারণগুলো থেকে বোঝা যায় কেন শিলিগুড়ি শহর অভিবাসীয় মানুষদের শহর হওয়া সত্বেও এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গৃহহীনতার বিরুদ্ধে, শহরের দারিদ্রের বিরুদ্ধে, পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শহরের সুযোগ সুবিধা না থাকার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে শান্তিপূর্ণ শহর বলে মনে হলেও তা মজবুত এবং চিরস্থায়ী নয়। অভিবাসীয় মানুষদের জীবনে হিংসা ও অশান্তি ক্রমাগত তাড়া করে বেড়ায়।

তথ্য এবং সংখ্যাগুলি 'রিপোর্ট শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' (২০০১), অর্চনা ঘোষ এন্ড আদারস্। বেসিক সার্ভিসেস ফর দা আরবান পুওর, আ স্টাডি অফ বরোদা, ভিলওয়ারা, সম্বলপুর এন্ড শিলিগুড়ি। নিউ দিল্লি ইন্সটিউড অফ সোসাল সায়েন্স, ১৯৯৫। এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে যেমন টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

কোশি থেকে দিল্লী অভিবাসীয় মানুষদের জীবন যাত্রা ও শ্রমের বিবরণ

পুষ্পেন্দ্র এবং মণিশ কুমার ঝা

এই লেখাটি কোশি এলাকার বন্যা অধ্যুষিত গ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো এবং যাজকতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এর সাথে দিল্লি শহরের অভিবাসনের কি সম্পর্ক তাও দেখানো হয়েছে। এইসব অভিবাসীয় মানুষেরা দিল্লী শহরে এসে কিভাবে বাস করে সেটা নিয়েও গবেষণা হয়েছে। তাদের কাজের জায়গা কিরকম এবং সরকার এখানে কি ভূমিকা পালন করে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে প্রচুর মানুষ বিহার থেকে অন্য জাগয়ায় গিয়ে কাজ খুঁজছে। অভিবাসন প্রক্রিয়াটি এতই বেশী যে দেখা যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে ৪.৫ থেকে ৫ মিলিয়ন বিহারের মানুষেরা কাজ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বিহার থেকে অভিবাসনের সংখ্যাটাই সবথেকে বেশী। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় বিহারের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় তিনটে স্তর আছে। প্রথম স্তরটি শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে যখন একটি সক্রিয় অভিবাসনের নীতি ছিল। পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতবর্ষের প্রচুর অভিবাসীয় গরীব মানুষেরা কাজের সন্ধানে যেত। দ্বিতীয় স্তরটি ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে যখন ১৯৬০-এর শেষে সবুজ বিপ্লব শুরু হল। তখন বিহার থেকে লোকেরা চাষবাষ যোগ্য স্থানে অভিবাসন করা শুরু করল। যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম ইউপি। তৃতীয় স্তরটি শুরু হল ১৯৯০ থেকে যখন উদারনীতির ফল স্বরূপ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন করা খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। যারা বিহার থেকে অন্য শহরে কাজের সন্ধানে যেত তারা ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করল। দিল্লী শহর ছিল অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থান। ১৩ শতাংশ বিহারী মানুষকে তারা ঠাঁই দিয়েছে। বিহার থেকে দিল্লীর অভিবাসনের বৃদ্ধির হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। দিল্লীর মোট মানুষদের মধ্যে বিহারের মানুষদের সংখ্যা ১৯৭১—১৯৮১ পর্যন্ত ছিল ৫.৭৭ শতাংশ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৯১—২০০১-এ ১৯.০৯ শতাংশ। মোট ৪.২৪ লক্ষ বিহারী অভিবাসীয় মানুষেরা দিল্লীতে বাস করে। দিল্লীতে প্রচুর মানুষ অভিসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে কারণ দিল্লীতে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। বিহার থেকে মোটামুটি কাছে তাই সময় এবং পয়সা দুটোই বাঁচে। ভাষাগত সুবিধা আছে। পাঞ্জাব, হরিয়ান এবং ইউপি থেকেও দিল্লী বেশ কাছে তাই অনেক বিভিন্ন মরসুমে তাদের গন্তব্যস্থানগুলি বদলাতে থাকে।

বিহারের বন্যা অধ্যুষিত অঞ্চল থেকেই সবচেয়ে বেশি অভিবাসন হয়। বন্যার ফলে ওই এলাকার বাসিন্দাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয় যে তারা কাজের সন্ধানে ওই এলাকা ছেড়ে অভিবাসন করতে বাধ্য হয়। সহর্ষা জেলা এমনই একটি বন্যা কবলিত অঞ্চল যেটি কোশি নদীর বন্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোশি নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে জেলার পশ্চিম দিকে বয়ে চলে। সবশেষে কাটিহার জেলায় গঙ্গায় গিয়ে মিশে যায়। এই জেলাটিতে প্রচুর বাঁধ রয়েছে যেগুলি কোশির সেচ প্রকল্পের মধ্যে পড়ে। অনেকগুলো গ্রামই বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়ে পড়ে কারণ, চারিদিকে বাঁধ দিয়ে ঘেরা আর জমানো বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন।

বন্যা অধ্যুষিত অ ঞ্চলের লোকেরা নানারকম সামাজিক শোষণের শিকার হয় এবং স্থানীয় কাজকর্মের সুযোগও খুব কম পায়। তাই অভিবাসন করতে তারা বাধ্য হয়। অভিবাসীয় মানুষেরা বিশেষ করে দলিত এবং ওবিসি-রা ভাবে যে অভিবাসন তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়, মুক্তি দেয়। অভিবাসনের ফলে স্থানীয় কর্মদাতাদের ওপর তাদেরকে নির্ভর করতে হয় না। দলিতরা খুবই দরিদ্র। এছাড়া উচ্চবর্ণের মানুষের থেকে তাদেরকে জাতপাত সংক্রান্ত নানা শোষনের শিকার হতে হয়। তাই গ্রামে থাকা এমনিতেই তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। স্থানীয় এলাকায় তারা যদি ঠিকমতন কাজ পেত তাহলে তাদেরকে অভিবাসন করতে হত না কারণ অন্য জায়গায় গিয়ে আখেরে পয়সার দিক দিয়ে বেশী লাভ হয় না। তবুও এরা এত জাতিগত শোষণ ও অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য এই অভিবাসনকেই বেছে নেয়।

অভিবাসনের ফলে তারা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি না পেলেও তাদের দারিদ্র্যের পরিমাণ কিছুটা কমে। তাদেরকে কোন অনুষ্ঠান বা উৎসবের ক্ষেত্রে প্রচুর ধারদেনা করতে হত। এভাবে তারা ধার করে, বন্ধক রেখে দারিদ্রের চরম সীমায় পৌঁছে যেত। অভিবাসনের ফলে তারা রোজগার করে। তাই তাদের ধারদেনার পরিমাণ কমেছে। তারা এখন প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ পায় যেগুলো তারা আগে পেত না। অনেকের বাড়িঘরেরও উন্নতি হয়েছে। অভিবাসন কি তাদের ভবিষ্যতকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে? এক মাঝবয়স্ক অভিবাসী পলটু সাদাই বলেছে যে ছোটখাটো অস্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে বা দিনমজুরের কাজের জন্য পঞ্জাব বা দিল্লীতে অভিবাসন করলে তা মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে ও কিছুটা অন্যভাবে জীবন কাটাতেও সাহায্য করে। তারা এমন কিছু বিষয়সম্পত্তির বা সম্পদের অধিকারী হতে পারে না যে তাদের আর অভিবাসনের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তারা অভুক্ত থাকে না। জমির মালিকদের কাছে তাদেরকে ভিক্ষা করতে হয় না। এটুকুই তারা অর্জন করতে পেরেছে। দিল্লিতে কাজের অবস্থা কেমন, তাদের থাকার জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা, বিহারী বলে তাদেরকে কোন অসম্মান করা হয় কিনা—এইসব বিষয়গুলি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। পল্টু বলে যে কাজের জায়গা স্বর্গের মত হবে এটা তারা কখনই আশা করে না। অনেক সময় তারা বাড়িতেই ভাল ব্যবহার আর সেবাযত্ন পায় না। বাইরের জগতে আর কি করে সেটা আশা করবে। সবক্ষেত্রেই ভাল আর খারাপ মানুষ দুই-ই থাকে। তাও এরা কাজ করছে এবং প্রত্যেক বছর নিরাপদে বাড়ি ফিরছে এটাই তাদের কাছে বড় ব্যাপার। এরা এই ধরনের অবস্থায় বাস করতে অভ্যস্ত। পৃথিবীর কোথাও সমতা নেই। তারা নিজেদেরকে দুর্বল মনে করে না এবং প্রতিকূল অবস্থায় তারা থাকতে পারে।

গবেষণাটি থেকে দেখা যায় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিবাসন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। এগুলো জমির পরিমাণ, জাতপাতের যাকজকতন্ত্র, ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। জাতপাত, শ্রেণি, জমির মালিকানা, মহিলা ও পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ—এই সব বিষয়গুলি কাজের ধরন ও সুযোগসুবিধার নিরিখে অভিবাসনকে প্রভাবিত করে। অভিবাসীয় মানুষদের কাজের জায়গা, তাদের গতিবিধি, গন্তব্যস্থল—এসব কিছুই নির্ভর করে তাদের উৎস জায়গার (তারা সেখান থেকে এসেছে) অবস্থার ওপর। অত্যন্ত দরিদ্র শ্রমিকেরা বেশিরভাগই অদক্ষ এবং মরশুমি কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাই তারা নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে কাজ করে। তাদের উৎস স্থানে তারা যে কাজ করত গন্তব্যস্থানে গিয়ে তারা সেই একই কাজ করে। তাদের রোজগারের টাকা তারা পরিবারকে দেয় সংসার চালানোর জন্য আর নিজেরা দৈনন্দিন খরচা করে। অভিবাসনের অভিজ্ঞতা খুবই কষ্টকর কিন্তু তারা এগুলোকে ভবিতব্য মনে করে। অনেকসময় শারীরিকভাবে অনেক বিপদজনক কাজও এরা করে থাকে। তারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে নানা নেটওয়ার্ক বা

যোগাযোগ তৈরি করে। এভাবে কাজগুলো তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়েও তারা কাঠামোগত হিংসা থেকে সহজে নিস্তার পায় না।

দিল্লী খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তাই নানারকম কাজের জন্য অদক্ষ এবং অল্প দক্ষের শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল। রাজ্যের রীতিনীতিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে দিল্লী শহর সবসময়ই বিভিন্ন রাজ্য থেকে অভিবাসনকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে কারণ সেখান থেকে প্রচুর শ্রমিক দিল্লীতে কাজে করে। কিন্তু সেইসব গরিব শ্রমজীবী মানুষেরা খুবই কষ্টকর অবস্থায় বাস করে। অনেকেই গৃহহীন, অনেকে রাস্তায় বা জনসধারণের এলাকায় থাকে, অনেকে কাজের জায়গায় রাত কাটায়, অনেকে আবার ছোটখাটো ঝুপড়িতে বাস করে যেখানকার অবস্থা খুবই অপরিষ্কার এবং পানীয় জল আর শৌচাগার পর্যন্ত নেই। এদেরকে ন্যূনতম সুবিধা আর থাকার জায়গা না দিতে পারা সরকারের একপ্রকার ব্যর্থতা। তাই এই থাকার জায়গা নিয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির সৃষ্টি হল। অনুমোদন ছাড়াই নানারকম বস্তি ও কলোনি গড়ে উঠল যেমন জুগ্যি ঝোপারি (জে.জে.) ক্লাস্টার, জে জে পুনর্বাসন কলোনি, বস্তি পুনর্বাসন কলোনি, অনুমোদন ছাড়া কলোনি, নিয়মমাফিক তৈরি আর নিয়েমের বাইরে তৈরি কলোনি। এছাড়া নির্দিষ্ট বস্তি এলাকা তৈরি হল। বর্তমানে দিল্লীর ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যা এরকম কলোনিতে বাস করে। (যদিও বেসরকারি ভাবে তা ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ। কারণ এই সংখ্যা নির্ভর করে সীমানার সংজ্ঞা এবং ভাগের ওপর)। পশ্চিম দিল্লীর কিছু জায়গায় ৯৫ শতাংশ অভিবাসীয় মানুষ মূলত জে.জে কলোনি এবং অনুমোদন ছাড়া তৈরি কলোনিতে বাস করে। যদিও নিয়মের বাইরে তৈরি কলোনিতে এবং নিয়মমাফিক তৈরি কলোনিতে গরিব মানুষ এবং তাদের তুলনায় কিছু ধণি মানুষ বাস করে, জে.জে কলোনি এবং বস্তির অন্যান্য ভাগ বা অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত দরিদ্র মানুষেরাই বাস করে এবং এরা মূলত অভিবাসীয়। মোটামুটি ৭.৫—৮ লাখ বসতি জে.জে. কলোনিতে। এরা উচ্ছেদিত হবার ভয়ে থাকে এবং বড়লোক আর স্থানীয় রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি আর মুনাফার জন্য নানারকম কৌশল প্রয়োগ করে যেটা এই গরিব মানুষদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় (হ্যাজার্ড সেন্টার, ২০০৭)। জে.জে কলোনির বাড়িগুলি খুবই ছোট। বেশিরভাগ ১০ ফিট বাই ১০ ফিট এবং তাতে বেশিরভাগ একটি করে ঘরই থাকে (ওয়াটার এন্ড ইন্ডিয়া, ২০০৫)। দিল্লীতে বসবাসের চিত্রটি দেখলে বোঝা যায় অভিবাসীয় মানুষ এবং গরিব লোকেরা কি অবস্থায় থাকে। সরকার এইসকল মানুষদের ইচ্ছে আর চাহিদা পুরণ করতে পারে না। সরকারই অবস্থানগত ভাগগুলি তৈরি করে যা এই মানুষদের অধিকারগুলিকে ঠিক করে। এইসব কলোনিতে পুনর্বাসন হলে একজন দরিদ্র পরিবার ১৮ বর্গ কিমি অব্দি জমি পায় যার জন্য তারা সারাজীবন লড়াই করে চলে। এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক করে যাতে তারা এই শহরে থাকতে জায়গা পায়। ৬-৮ জন একটা ছোট করে খুপরিতে বাস করে এবং বছরের পর বছর তাদের আয়ও মোটামুটি একই থাকে আর তারা লড়াই করে চলে।

দিল্লীর অভিবাসীয় মানুষদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।পূর্বে এই অভিবাসনের ধারাটি উঁচু জাতের মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

নানা লোকের সাথে এবং সমাজকর্মীদের সাথে কথা বলে বোঝা গেল যে এই ধারাটি অন্যান্য সামাজিক শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই পরিবর্তনটির অন্যতম কারণ হল বছরের পর বছর ধরে চলা অভিবাসনের অভিজ্ঞতা যা সামাজিক অবলম্বন, নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে।

মোবাইল ফোন আর রেলওয়ের জন্য এটি আরও সহজ হয়েছিল। এই দু'ধরনের অভিবাসীয় মানুষদের মধ্যে পার্থক্যগুলি খুব সহজেই দেখা যায়। প্রথম দলটি দশ বছরেরও কম সময় দিল্লীতে এসে বাস করছে এবং সাম্প্রতিকালে তাদের কাজের সুযোগ পেয়েছে। এরা নিয়মিতভাবে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। যে কোনো উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা গ্রামে যায় এবং তাদের রোজগারের একটা অংশ বাড়িতে পাঠায়। দ্বিতীয় দলটি দিল্লীতে বহু বছর ধরে বাস করে এসেছে। তারা তাদের পরিবারকে দিল্লীতে নিয়ে এসেছে এবং কলোনিগুলিতে স্থায়ীভাবে বাস করছে। তাদের রোজগারের টাকা তারা গ্রামে পাঠায় না বা পাঠালেও নিয়মিত নয়। সময়ের সাথে সাথে এই ক্রমাগত চলমান অভিবাসীয় মানুষ এবং স্থায়ীভাবে বাস করা অভিবাসীয় মানুষদের পার্থক্যগুলো ফিকে হয়ে আসে। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী উন্নয়ন এক সময় আঞ্চলিক উন্নয়নের সৃষ্টি করে। তাই উন্নত এবং অনুন্নত অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। উন্নত অঞ্চলগুলি পুঁজিবাদী বৃদ্ধির এবং সম্প্রসারণ কাজের প্রাণকেন্দ্র। তাই এরা অনুন্নত অঞ্চলগুলি থেকে শ্রমিকদের ইচ্ছে বা অনেকসময় ইচ্ছের বিরুদ্ধেও শ্রম বাজারে টেনে আনে। এটা হল অভিবাসনের বৈশিষ্ট্য। নগরায়ণ, পরিষেবা বৃদ্ধি, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, অস্থায়ী কাজের প্রভাব—এ সবই শ্রমনির্ভর। তাই বহু মানুষ এইসব কাজ করতে শহরে আসে। নয়াউদারনিতির ফলে অভিবাসন প্রক্রিয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অভিবাসীয়ও শ্রমিকদের বিষয়টি বুঝতে গেলে তাদের উৎস স্থান এবং তাদের গন্তব্যস্থান—এই দুটি বিষয়কে উৎপাদনের নিরিখে বুঝতে হবে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটিও বুঝতে হবে।

অভিবাসন, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় যেটা তাদের উৎস স্থান এবং গন্তব্যস্থান দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে শ্রম নানাভাবে শোষিত হয়, ভাঙতে থাকে এবং হিংসার শিকার হয়। সামাজিক পরিষেবা থেকে এরা বঞ্চিত হয়। এরা অনেকে কাজের জায়গা থেকে বাদ যায় এবং দরদাম করার ক্ষমতা থাকে না। গরিব মানুষেরা বেশিরভাগই শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ। অভিবাসীয় দরিদ্র মানুষদের এই কঠিন অবস্থার জন্য সামাজিক পরিকাঠামো, তাদের উৎস স্থানের অবস্থা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কই দায়ী। কিছু অভিবাসীয় মানুষেরা তাদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন কাজ করে, তাই তারা ক্রমাগত অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে থাকে। এরা মূলতঃ চাষবাস করে আর বেশিরভাগ দলিত আর ও.বি.সি সম্প্রদায় থেকে আসে। শ্রেণি এবং জাতিগত বিভেদ, জমিহীন অবস্থা, অল্প মাইনে, কাজের অভাব, ''দক্ষতার অভাব'', চাষবাসে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ধারদেনা ইত্যাদি তাদের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক অবস্থানকে গঠন করে। তাদের অবস্থা ও ক্ষমতা উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে। এই কাঠামোগত অবস্থাগুলি গ্রামীণ অভিবাসীয় মানুষদের জীবনের অঙ্গ। এগুলো শহরের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক যাজকতন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাই তাদের উৎস স্থানের অবস্থা আর ক্ষমতা তারা তাদের গন্তব্যস্থানেও প্রদর্শন করে। তাই উৎসস্থান আর গন্তব্য স্থানের মধ্যে দিয়ে এক কঠিন বৃত্তের বা জালের সৃষ্টি হয়েছে। যারা শহরে এসে বাস করে তারা তাদের অবস্থার খানিকটা পবির্তন করতে সক্ষম হয় এবং তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু ঐুযোগ সুবিধে তৈরি করতে পারে।

পুরো লেখাটি পড়তে হলে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন ঃ
http //www.mcrg.ac.in/pp74.pdf

Other MCRG Reports

Rohingyas : The Emergence of a Stateless Community
http://www.mcrg.ac.in / Rohingyas / Report_Final.pdf

Research on the Humanitarian Aspects along the Indo - Bangladesh Border
http://www.mcrg.ac.in /Indo_Bangladesh_Border / Report_on_Indo_Bangladesh_Border.pdf

Making Women Court for Peace : Gender, Empowerment and Conflict in South Asia
http://www.mcrg.ac.in / M_Women / A_ Report_Making_Women_Court.pdf

Governance and peace - Building
http://www.mcrg.ac.in / Core / Guwahati_Core.pdf

Interrogating Forced Migration : A Research Workshop
http://www.mcrg.ac.in / WC_2015 / Final_Report_on_Interrogaing_Forced_Migration.pdf

Voices of the Internally Displaced in South Asia
http://www.mcrg.ac.in / Voives.pdf

Eroded Lives
http://www.mcrg.ac.in / Eroded_Lives.pdf

The Responsibility to Protect IDPs and Our National and State Human Rights Commissions
http://www.mcrg.ac.in / Responsibility_toProtect.pdf

Annual Winter Course Report on Forced Migration (One to Ten)
http://www.mcrg.ac.in / rp_wc.asp

A Dialogue on Protection Strategies for People in Situations of Forced Migration
http://www.mcrg.ac.in / UNHCR conference / home.html

Gender, Media and Human Rights
http://www.mcrg.ac.in / mediareport05.htm

Media and Displacement I, II, III
http://www.mcrg.ac.in / rp_md.asp

Civil Society Dialogue on Human Rights and Peace
http://www.mcrg.ac.in / rp_autonomy.asp

Research Papers under this Project

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor - I : Migration and the Urban Question in Kolkata
  http://www.mcrg.ac.in / PP 72.pdf

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor - II : Migration and the Urban Question in Mumbai
  http://www.mcrg.ac.in / PP 73.pdf

- Cities, Rural Migrants and the Urban Poor - III : Migration and the Urban Question in Delhi
  http://www.mcrg.ac.in / PP 74.pdf

- Policing a Riot - torn City : Kolkata, 16 -18 August 1946
  http://www.mcrg.ac.in / PP 69.pdf

Reports of Other MCRG - Ford Foundation Projects

- A Research and Dialogue on Autonomy
  http://www.mcrg.ac.in / autonomy / autoreport.htm

- A Research and Dialogue Programme on Social Justice in India
  http://www.mcrg.ac.in / S_J_Report.pdf

- Development, Democracy, and Governance - Lessons and Policy Implications
  http://www.mcrg.ac.in / Ford. pdf

Mahanirban Calcutta Research Group

GC- 45, First Floor, Sector -III, Salt Lake City
Kolkata - 700 106, West Bengal, India
Phone : +91-33-23370408, Fax: +91-33-23371523
E-mail: mcrg@mcrg.ac.in; Web: http://www.mcrg.ac.in